Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শহীদুল জহিরের ছোটগল্প : জীবনসংকটের স্বরূপ

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tashrik-E-Habib
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.5
Pages	৮৩-১০৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শহীদুল জহিরের ছোটগল্প : জীবনসংকটের স্বরূপ

তাশরিক-ই-হাবিব*

একজন সংবেদনশীল শিল্পী সমকালীন সামাজিক প্রতিবেশ, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার এবং জীবন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার নির্যাসকে অবলম্বন করে যখন সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন তাতে অনিবার্যভাবেই প্রতিবিম্বিত হয় তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, নিজস্ব জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরুচি। এভাবেই তিনি কালজয়ী হয়ে ওঠেন পাঠকের কাছে, অর্জন করেন স্বীয় মনন ও শ্রমনিষ্ঠার স্বীকৃতি। শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) জীবদ্দশায় বাঙালি পাঠকের নিকট যতটা পরিচিত ছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর পরিচিতি নিঃসন্দেহে বহুলাংশেই বেড়েছে[১]। ছাত্রাবস্থায় গল্প লেখার যে সচেষ্ট আন্তরিকতা তাঁকে সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিল[২], আজীবন ধরেই তিনি সেই সাধনায় আন্তরিকভাবে নিমগ্ন থেকেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যতই নিভৃতচারী হন না কেন[৩], সংবেদনশীল মানুষ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে সাহিত্যকর্মে তিনি যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠ। কথাসাহিত্যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা প্রায়শই গ্রাম ও শহরের নিম্নধ্যবিত্ত ও গড়পরতা মধ্যবিত্তের অন্তর্গত। তবু তাদের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, স্বার্থ-সংঘাত ও আস্থাশীলতার শিল্পায়নে তিনি কোনো বিশেষ দার্শনিক বা রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত নন। সামন্ততন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অসম বিস্তার এদেশের আপামর মানুষের জীবনপ্রবাহে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে দুই প্রধান ধর্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্ট ভেদাভেদ, রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সমবায়ে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বসংকট [৪] আরো জটিল রূপ পেয়েছে। শহীদুল জহিরের যেসব ছোটগল্পে এসব প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশ পেয়েছে, তার বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধে আমাদের অন্বিষ্ট।

'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে' গল্পে ব্যক্তির অস্তিত্বসংগ্রাম, জীবনসংকট ও নৈয়ায়িক অবস্থানের সূত্রে পারিপার্শ্বিক সামাজিক প্রতিকূলতা, বিপন্ন মানবিক প্রতিবেশের সমান্তরালে সমষ্টিমানুষের নঞর্থক মনোভঙ্গির আন্তঃসম্পর্ক রূপায়িত হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলফাজউদ্দিন আহমদ তার পিতৃপ্রদত্ত নামের চেয়ে বরং পুরাতন ঢাকার মহল্লাবাসীর ব্যঙ্গোক্তিসূচক 'নবাব' সম্বোধনেই পরিচিত, বংশগত প্রসিদ্ধিগুণে। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বিপত্নীক এই মধ্যবয়সী মানুষটির ভাসমান জীবন সমাজস্রোতের নানা চড়াই-উৎড়াই ডিঙিয়ে কিছুদিনের জন্য স্থিত হলেও পুনরায় নতুন গন্তব্যের খোঁজে তাকে পাড়ি দিতে হয়। তার বৈষয়িক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সে যখন সংসারী, ততদিনে মা-বাবা তাকে ছেড়ে পরলোকগত। সৎমা ও সৎ ভাইবোনদের সঙ্গে তার ছিল না কোনো ধরনের যোগাযোগ। এমনকি বিয়ের মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে স্ত্রীকেও সে হারায়। প্রিয়জনদের হারানোর বেদনা, স্বভাবগত শৈথিল্য এবং জীবন সম্পর্কে উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গি

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তার অন্তর্লোকে জন্ম দিয়েছিল নিরাসক্তি, মর্যাদা-খ্যাতির প্রতি ঔদাসীন্য। তবু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে কখনো রিকশাচালনা, কখনো সাহেবের বাড়ির মালির কাজ সে বেছে নিয়েছিল একমাত্র শিশুপুত্রের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। এভাবেই অতিক্রান্ত হয় কয়েক বছর। অবশেষে দশ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে তার আবির্ভাব ঘটে পুরাতন ঢাকার আনন্দ পাল লেনে। একজন বহিরাগত হিসেবে মহল্লাবাসীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রথম থেকেই তাকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেগুলো হলো — প্রথমত, মহল্লাবাসীর সঙ্গে তার আচরণে রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। বিশেষত পারিবারিক পরিচয় বিবেচনায় সে যে অন্যদের চেয়ে মর্যাদাবান, এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার 'খুবই শুদ্ধ বাংলায় কথা' (জহির, ২০০৭ : ৪৩) বলার প্রবণতায়। দ্বিতীয়ত, মহল্লাবাসীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে না ফেলে বরং দূরত্ব বজায় রাখার অভিপ্রায় তার আচরণে প্রবলভাবে সক্রিয়। তাই 'নবাব' সম্বোধনের মাধ্যমে সে মহল্লাবাসীর বিদ্রুপের সম্মুখীন হয়। একটি ব্যাংক অফিসে মেথরবৃত্তিতে নিয়োজিত থেকে অর্জিত স্বল্প বেতনে ছেলেকে নিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে হিমশিম খেতে হয় বলে তাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে মহল্লাবাসীর ওপর নির্ভর করতে হয়। আনন্দ পাল লেনে সে মন্দিরের পুরোহিত নেপাল ঠাকুরের নির্মিত কুঠুরি ভাড়া নিলেও নিয়মিত এর মাসিক ভাড়া পরিশোধে অসামর্থ্যের পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, পানের দোকানদার ফজলু ও ডালপুরি বিক্রেতা দিলুর কাছেও তার দেনা দিনদিন বেড়ে চলে। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে তার দূরত্বসূচক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তার অন্তর্লোকে পুঞ্জীভূত বেদনাবোধ, প্রিয়জনদের হারানোর হাহাকার, তরুণ বয়সের খামখেয়ালিপনাবশত ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রভৃতির পাশাপাশি বর্তমানের দুঃসহ বাস্তবতার কশাঘাতে জর্জরিত হওয়ার মতো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গসমূহ কাউকে জানাতে সে অনীহ। অথচ পুরাতন ঢাকার জনমনস্তত্ত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, নিত্যদিনের বহমান জীবনস্রোতের অতি তুচ্ছ প্রসঙ্গও একে অন্যকে জানাতে অকুণ্ঠ। এর ফলে নবাবের প্রতি মহল্লাবাসীর আচরণে প্রকটিত হয় ব্যক্তির প্রতি সমষ্টিমানুষের সংশয়গ্রস্ততা, ঈর্ষাকাতরতা ও দূরত্ববোধ। নবাব অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে কুষ্টিয়ার অজ পাড়াগাঁ থেকে পুরাতন ঢাকায় ভাসমান জীবন কাটাতে বাধ্য হয় শুধু একটি স্বপ্নকে বাস্তবায়নের আগ্রহে — দশ বছরের ছেলে রফিককে মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ জীবন গড়ে দিতে। তবে মহল্লাবাসীর ক্রমাগত বিরূপ আচরণে অতিষ্ঠ নবাব অনুধাবন করতে পারে, পুনরায় তাকে পাততাড়ি গোছাতে হবে এ মহল্লা থেকে। কারণ 'সব দুধ টকে গেছে, সব পানি ঘোলা হয়ে গেছে' (জহির, ২০০৭ : ৪৯)। অন্যদিকে তার প্রতি মহল্লাবাসীর ক্ষোভও দিন দিন পুঞ্জীভূত হতে থাকে। বিশেষত তার পাওনাদারেরা এতটাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে যে প্রাপ্য পাওনা আদায়ের পরিবর্তে বরং যে কোনোভাবে আনন্দ পাল লেন থেকে তাকে বিতাড়িত করতে তারা বদ্ধপরিকর। নবাবের সঙ্গে মহল্লাবাসীর সম্পর্কগত রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি নাটকীয় ঘটনার অভিঘাতে। যেহেতু তাকে মহল্লা থেকে বলপূর্বক বিতাড়ন সভ্য সমাজের শিষ্টাচার বহির্ভূত, তাই তারা ওত পেতে ছিল চারিত্রিক স্খলন ও নীতিহীনতার অভিযোগে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে। তবে নবাবের স্বভাবে এরূপ ভাবনা কখনো স্থান পায়নি। তবু নাটকীয়ভাবে এক বৃষ্টিস্নাত রাতে শিশুসন্তানসহ জনৈক ভিখারিনীকে বিপন্নতার কবল থেকে বাঁচিয়ে নিজের কুঠুরিতে আশ্রয় দানের পরিণতিতে

মহল্লাবাসীর কাছে তাকে চরিত্রহীনতার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়। এ ঘটনার নায়ক ফজলু নবাবের ওপর বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে মহল্লাবাসীকে বিষয়টি অবহিত করে। এর পরিণতিতে নবাব শারীরিক ও মানসিকভাবে মহল্লাবাসীর নিগ্রহের শিকার হয়। শুধু তাই নয়, সকলে মিলে তাকে চাপ দেয় সেই ভিখারিনিকে বিয়ে করার জন্য। এহেন পরিস্থিতিতেও নবাব নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা হারায় না। কেননা, সে যে অপরাধ করেনি, এর দায়ভার নিতে সে অসম্মত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বারবার আঘাত পেয়ে সে অভ্যস্ত বলেই এ ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে সে ধারণা করে নিয়েছিল। তবু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সে এ অনৈতিক ও অযৌক্তিক প্রস্তাব মেনে নেয়নি। এর পরিণতিতে তাকে হয়তো শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং মহল্লা থেকেও বিতাড়নের আশঙ্কা রয়েছে। তবু যে অন্যায় নবাব করেনি, এর দায়ভার গ্রহণে সে অস্বীকৃত। কোনোমতে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস এতদিন অব্যাহত রাখলেও অবশেষে চরম বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে সে দৃঢ়কণ্ঠে একাধিকবার 'না' উচ্চারণের মাধ্যমে অস্তিত্বরক্ষার নিরন্তর টানাপড়েনের অবসান ঘটায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপন্ন ও জর্জরিত নবাবের অস্তিত্বরক্ষার দুর্মর প্রণোদনা তার যাবতীয় হীনম্মন্যতা ও অসামর্থ্যকে উপেক্ষাপূর্বক অবশেষে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ গল্প প্রসঙ্গে কুমার চক্রবর্তীর অভিমত —

> 'ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে'-র নবাব চরিত্রটিও এক গভীর পরাজিত চরিত্র যে বাঁচার জন্য অপাঙক্তেয় ছলচাতুরির আশ্রয় নেয় পরাজয়ের চোরাবালি থেকে উদ্ধারের জন্য, কিন্তু পারে না, অবশেষে তলিয়ে যাওয়ার সংকেত ও সম্ভাবনার আবর্তে পড়ে যায়। আমরা দেখি তার পরাজয়ের বহুমাত্রিক স্তরকে। (রশীদ, ২০১০ : ৩২৮)

এ বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিবেচনাসম্মত নয়। নবাব জীবনের বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই পাড়ি দিতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, তা সম্পূর্ণই পরাভূত মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত নয়। জীবনের প্রথম পর্যায়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অসচেতনতা এবং পরিকল্পনাহীনতার কারণে সে বৈষয়িক উন্নতি ও শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবনে সমর্থ হয়নি। কিন্তু যখন সে বিপত্নীক এবং এক সন্তানের জনক, তখন তার নিশ্চিন্ত, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে নবাব বারবার জীবনসংগ্রামে উত্তীর্ণ হবার প্রচেষ্টা চালায়। মেথরের কাজ বাঙালি সমাজে ঘৃণ্য ও তাচ্ছিল্যজনক হলেও ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সে এ পেশা অবলম্বনে ছিল নির্দ্বিধ। অবশেষে যখন জনৈক ভিখারিনি নারীকে লাঞ্ছনার দায়ে মহল্লাবাসী তাদের জিম্মি করে জোরপূর্বক বিয়ে দিতে চায়, তখন সে ভবিষ্যৎ পরিণতি উপেক্ষা করে নিজের অবস্থানে অটুট থাকে। তার এই অকুতোভয়, হার না মানা মনোভঙ্গির সঙ্গে মহল্লাবাসী ইতঃপূর্বে পরিচিত ছিল না। সে যে দৃঢ়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে অনড় অবস্থান গ্রহণ করতে সমর্থ, তাতেই প্রতিভাত হয়, জীবনের জয়-পরাজয় বড় কথা নয়। বরং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে প্রকাশের সামর্থ্য এবং ভাবনাকে বাস্তবায়নেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত।

'আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই' গল্পে অবরুদ্ধ সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বলয়ে শৃঙ্খলিত ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বসংকট সাবলীলভাবে বাঙ্ময় হয়েছে। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশের সংকীর্ণ পরিসর ও তার স্বভাবগত সীমাবদ্ধতার পরিণতি যে

কখনোই সদর্থক নয়, এ গল্পের 'শীর্ণ এবং কালো রঙের একজন মধ্যবিত্ত কেরানি' (জহির, ২০০৭ : ৫৫) আবদুস সাত্তারের জীবনবৃত্তান্তে তা পরিস্ফুট। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্গত সৃষ্টিশীলতা, সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার বাস্তবায়নে এ শ্রেণিকে কীভাবে হতাশাগ্রস্ত মানসিকতার শিকার হতে হয়, তা প্রতীয়মান হয় তার নিত্যদিনের চালচিত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক আবদুস সাত্তারের সাংসারিক জীবন সচ্ছল, নিশ্চিন্ত। সরকারি চাকরির আরোপিত দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে সে প্রাপ্য যাবতীয় সুবিধা যথারীতি ভোগ করে। চার বছর ধরে সে সরকারি কলোনির[৫] বাসিন্দা, যার অধিবাসীরা 'বিভিন্ন সরকারি অফিসের কেরানি, ইন্সপেক্টর এবং পাতি কর্মকর্তাবৃন্দ' (জহির, ২০০৭ : ৫৬)। আপাতদৃষ্টিতে পারিবারিক ও সাংসারিক আবহে, চাকরিস্থলের সামাজিক পটভূমিতে তাকে নিশ্চিন্ত, ঝামেলামুক্ত মানুষ মনে হলেও তার চেতনালোকে প্রোথিত রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবোধের বিষবৃক্ষ। লক্ষণীয়, সংসারে তার ভূমিকা নিছক অর্থ উপার্জনকারী হিসেবেই সীমাবদ্ধ। রুটিনমাফিক অফিসগমন ও বিকেলে বাড়ি ফিরে একাকী ব্যালকনির বারান্দায় নীরবে বসে থাকা, খাওয়া ও ঘুম — এ যান্ত্রিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না তার প্রাত্যহিক জীবনে। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে তার আবেগঘনিষ্ঠ বন্ধনের পরিচয় সমগ্র গল্পে অনুপস্থিত। তার নেই কোনো বিশেষ শখ, জীবনকে উপভোগের আগ্রহ। পারিপার্শ্বিক সমাজে কী ঘটে চলেছে, সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। এমনকি প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার বাকবিনিময় ঘটে কালেভদ্রে — সেটিও বিশেষ পরিস্থিতিগত প্রয়োজনে। নিজের চেতনালোকে সন্নিহিত হতাশা, গতানুগতিক জীবনের অবসাদ, নাগরিক সমাজের একাকিত্ব এবং প্রিয়জনের প্রতি প্রায় আবেগশূন্য সংবেদনার মিথস্ক্রিয়ায় সে ব্যালকনিতে বসে নিমজ্জিত হতে চায় রাতের ঘনায়মান অন্ধকারে। চাকরি তার জন্য সময় অতিবাহিত করার মাধ্যম বিশেষ, অথচ কাজের ভারে সে ক্লান্ত হয় না; কর্তব্য সম্পাদনের আনন্দ বা উৎফুল্লতাও তাকে আপ্লুত করে না। চার বছর ধরে এ কলোনির বাসিন্দা হওয়ায় একটি নিরাপদ ও উদ্বেগহীন জীবনের অধিকারী হয়েও অন্তর্লোকে প্রতিনিয়তই সে শূন্যতাবোধে আক্রান্ত। কেননা যে রাষ্ট্রে তার বসবাস, সেখানে সরকারি চাকরিজীবী হওয়ায় আর্থিক নিরাপত্তা ও বাসস্থানগত নিশ্চয়তা থাকলেও মানুষের ব্যক্তিক স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়। ফলে নিজের প্রত্যাশা, স্বপ্ন, সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের অভীপ্সা গুমরে মরে বলে সে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। অথচ আবদুস সাত্তারের অন্তর্গত নিঃসঙ্গতা অতিক্রমণে তার স্ত্রী শিরীন বানুও অপারগ। দিনের পর দিন গতানুগতিক জীবনপ্রবাহের পুনরাবৃত্তির পরিণতিতে 'আবদুস সাত্তার একটি অজর এবং অবশ্যম্ভাবী প্রস্তরখণ্ডের মতো নিশ্চল অস্তিত্ব নিয়ে জেগে থাকে' (জহির, ২০০৭ : ৫৭)। কলোনিবাসীর রোপিত নয়নতারা ফুলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলুদ প্রজাপতিদের প্রতি কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে সেখানে অচিরেই বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার অবসান ঘটে নতুন সামরিক সরকারের দেশের ক্ষমতা গ্রহণের পর মিরপুর চিড়িয়াখানার উন্নয়নকর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এর পরিণতিতে বিকেলে ব্যালকনিতে বসে নির্জন প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় অবগাহনের সুযোগ আবদুস সাত্তারের নিকট আবার ফিরে আসে। মানবজীবন যে নাটকীয়তায় ভরপুর, তার প্রমাণ পাওয়া যায় শহরে আকস্মিক ভূমিকম্পের ঘটনায়। এক সন্ধ্যায় ভূমিকম্প শুরু হলে বারান্দায় বসা আবদুস সাত্তার নিচে নেমে যাবার সময়

রেলিংয়ে বসানো দুটি নয়নতারা গাছকে টবসহ রক্ষা করতে গিয়ে শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যে জীবদ্দশায় কখনো ফুলের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করেনি, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে নিজের ও প্রিয়জনের কথা চিন্তা না করে বরং নয়নতারা গাছের জীবনরক্ষায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আবদুস সাত্তারের পরিণাম নির্দেশে এ ঘটনার গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যবহ। সম্ভবত নিজের অবচেতনে প্রকৃতির প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় বিমুগ্ধতা। সমাজ-সংসারের কারো কাছেই নিজের অন্তর্লোকে পুঞ্জীভূত অবসাদ মুছতে পারত না বলেই সারাদিনের কর্মক্লান্ত পরিসর থেকে বাড়ি ফিরে তরু-লতা শোভিত প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকা সেই ছোট ব্যালকনিকে সে পরমাশ্রয় করেছিল। তাই সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে আবদুস সাত্তার নয়নতারা গাছদুটিকে রক্ষায় মরীয়া হয়েছিল। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমতা যে তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে তখনো বিলীন হয়ে যায়নি, সচেতন মনে তা কখনো উপলব্ধি না করলেও নয়নতারা ফুলের দুটি টবকে রক্ষার প্রচেষ্টায় এ সত্য উদ্ভাসিত হয়। ভূমিকম্পের ঘটনায় আগারগাঁও কলোনির একমাত্র মৃত ব্যক্তি আবদুস সাত্তারের পাশাপাশি সকল নয়নতারা গাছের উন্মূলিত হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে বাস্তবতার গণ্ডি অতিক্রম করে জাদুবাস্তবতায় উত্তীর্ণ। নয়নতারার প্রতি জীবদ্দশায় তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ পরিব্যক্ত না হলেও ভূমিকম্পকালীন সংকটময় মুহূর্তে দুটি নয়নতারা গাছকে রক্ষার জন্য নিজেকেই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উন্নীত করার ক্ষেত্রে তার যে অবিশ্বাস্য প্রয়াস, (যদিও তা আবদুস সাত্তারের ইচ্ছাকৃত নয়, বরং সেই সংকটপূর্ণ সময়ের পটভূমিতে সহজাত বোধের দ্বারা তাড়িত হওয়ার শোচনীয় পরিণতি) তারই অনিবার্যতায় হয়তো কলোনির মাটিতে প্রতিপালিত সব নয়নতারা গাছ মৃত্যুবরণ করে। এরপর কলোনিবাসীর নবোদ্যমে নয়নতারার নতুন চারা রোপণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুনরায় সেগুলির অকালমৃত্যুর ঘটনায় তাদের উদ্যোগে কৃষি কলেজের একজন অধ্যাপকের এক মাসের কঠোর পরিশ্রমও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কৃষিবিদের নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, আবদুস সাত্তারের গলিত মস্তিষ্কের মগজ কলোনির যে স্থানে পতিত হয়েছিল, শুধু সেখানেই নতুন চারটি নয়নতারা গাছ গজিয়েছে, অন্যত্র নয়। এমনকি এদের একটিকে অন্যত্র সরানোর প্রচেষ্টা চালাতেই সেটি মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়। অথচ পূর্ব স্থানে আনলে সেটি ফিরে পায় তার স্বাভাবিক প্রাণবন্ত রূপ। উক্ত ঘটনার অস্বাভাবিক ও অব্যাখ্যাত কার্যকারণের স্বরূপ সম্পর্কে কৃষিবিদের অনুমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে পূর্বোক্ত হলুদ প্রজাপতির উদ্দীপক ভূমিকা পালনের প্রসঙ্গ। নতুন রাস্তা নির্মাণ ও জঞ্জাল নির্মূলের তাগিদে সরকারের গণপূর্ত বিভাগের অবশিষ্ট নয়নতারা গাছগুলো কর্তনের ফলে আগারগাঁও কলোনি নয়নতারা গাছশূন্য হয়ে পড়ে। গাছগুলো রক্ষার জন্য আবদুস সাত্তারের মৃত্যুর ঘটনা আত্মহত্যা বা স্বেচ্ছামৃত্যু নয়, বরং নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু তার মৃত্যুর পরবর্তীকালে তার মস্তিষ্কের গলিত মগজের রসে পুষ্ট হয়ে নয়নতারা গাছের অচিরেই জন্মগ্রহণ এবং পূর্ববর্তী গাছসমূহের মৃত্যুর ঘটনায় এ বিষয়টির মাধ্যমে লেখক কোনো বিশেষ ইঙ্গিত প্রকাশে আগ্রহী। আবদুস সাত্তারের মতো আপাতনিষ্ক্রিয় কেরানির সংবেদনশীলতার পরিচয় কলোনিবাসী, এমনকি তার স্ত্রী না পেলেও তা পরিস্ফুট হয় ভূমিকম্প চলাকালে নয়নতারা গাছের প্রতি তার বিস্ময়কর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে। অর্থাৎ কলোনির অবরুদ্ধ সমাজে সংবেদনশীল মানুষের সকল

সম্ভাবনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও জীবনের প্রতি প্রগাঢ় মমত্বের বোধ তার চেতনালোকে সংগুপ্ত থেকেই যায়; যা তাকে উদ্বুদ্ধ করে ধরা-বাঁধা শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থাতেও অন্যকে বিপন্নতার করালগ্রাস থেকে উদ্ধারে। তবে এর বাস্তবায়ন যে দুরূহ, তা গল্পের পরিণতি অংশেই নির্দেশিত। গল্পটিতে আকস্মিক ভূমিকম্পে জনজীবনের বিপর্যয় পরোক্ষ অর্থে স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের সংকটকেই ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে। কলোনিবাসী এর প্রতিষ্ঠাতাদের নির্দেশানুযায়ী পরাধীন অথচ নিরাপদ শৃঙ্খলিত জীবনে বাধ্যগত হলেও নয়নতারা গাছগুলোর স্বেচ্ছামৃত্যু পরোক্ষ অর্থে কলোনিতে অবরুদ্ধ সংবেদনশীল মানুষের অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকার সুযোগকে উপেক্ষা ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অনমনীয় অবস্থানেরই প্রতীক। এভাবেই ভূমিকম্পকালীন সংকটের ভয়াবহ মুহূর্তে নয়নতারা গাছকে রক্ষার প্রচেষ্টায় আবদুস সাত্তারের অপমৃত্যু এবং পরবর্তী পর্যায়ে কলোনীবাসীর পুনরুদ্যোগে সেই গাছ রোপণের প্রচেষ্টাগত ব্যর্থতা সমার্থক হয়ে ওঠে। গাছগুলোর স্বেচ্ছামৃত্যু পরোক্ষ অর্থে কলোনির প্রতি সংবেদনশীল মানুষের বিদ্রোহ এবং এর অবসানকল্পে তাদের আত্মত্যাগের সমুন্নত মহিমায় উত্তরণের প্রতীকী তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। এ গল্পে কলোনির বদ্ধায়ত পরিবেশে বৈকল্যগ্রস্ত মানুষের স্বল্প পরিসরে প্রকৃতিকে প্রতিপালনের প্রতীকে লেখক বাংলাদেশের নব্বইয়ের দশকের প্রারম্ভভাগের রাজনৈতিক সংকটের অভিঘাতে জনজীবনের অস্তিত্বগত বিপন্নতার ভয়াবহ রূপকেই জাদুবাস্তবতার প্রকরণে নবতর ব্যঞ্জনায় উন্নীত করেছেন। ব্যক্তির ভূমিকা যখন প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর দিনযাপনে কৃত্রিম ও ভারবহ প্রতিভাত হয়, তখন তার অস্তিত্ববোধ নিজের কাছেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সমকাল বিযুক্ত নগরবাসী আধুনিক মানুষের অস্তিত্বসংকটের প্রতিনিধি হিসেবে আবদুস সাত্তার চরিত্রের রূপায়ণ তাই প্রাসঙ্গিক, তাৎপর্যবহ। এ গল্প সম্পর্কে মিহির মুসাকীর অভিমত —

> ভূমিকম্পে বারান্দার রেলিঙ থেকে পতনশীল নয়নতারা গাছের টব রক্ষা করতে গিয়ে টবসহ আবদুস সাত্তারের পতন এবং অপঘাতে মৃত্যুবরণ একদিকে যেমন অস্বাভাবিক ও ট্রাজিক, অন্যদিকে তার মৃত্যুর পর তার মাথার থেঁতলে যাওয়া মগজের অংশ থেকে জন্ম নেয়া নয়নতারা গাছের হৃষ্টপুষ্ট বেড়ে ওঠা আর অন্য সকল নয়নতারা গাছের মৃত্যু হওয়ার ঘটনা একেবারেই অবিশ্বাস্য এবং যুক্তিহীন; তবে এও হতে পারে কোনো প্রতীক, যদিও এধরনের প্রতীকের ব্যবহার সীমিত হওয়াই ভালো। এ গল্পে একটি জায়গায় বলা হয়েছে — 'তাহলে কি গাছগুলো মস্তিষ্কেও কোনো উপাদান খাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে?' শহীদুল জহিরের এ জাতীয় গল্প ... পাঠকের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমূলক। ... গল্পে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এ জাতীয় রূপকথার অযৌক্তিক মায়াজাল গল্পের মূল সুরকে নষ্ট করেছে ... (রশীদ, ২০১০ : ৪৩৮)

আমরা এ বক্তব্যের সমর্থক নই। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের বিষয়টি আবদুস সাত্তারের স্বভাবে বরাবরই ছিল, যদিও গল্পে সে প্রসঙ্গ প্রকটভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। কর্মক্লান্ত মানুষটি বাড়ি ফিরে সাংসারিক ব্যস্ততায় মগ্ন না হয়ে বরং নীরবে গাছপালাশোভিত ব্যালকনিতে একা বসে যে সন্ধ্যা থেকে রাতের অনেকটা সময় অতিবাহিত করত, তাতে বিষয়টি ইঙ্গিতবহ। তাই ভূমিকম্পের সময় আকস্মিকভাবে নয়নতারা গাছ রক্ষা করতে দিয়ে তার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু আমাদের নিকট বিস্ময়কর মনে হলেও তা 'অস্বাভাবিক' নয়। তিনি আবদুস সাত্তারের মাথার মগজের অংশ গ্রহণ করে কয়েকটি নয়নতারা গাছের সবল

বৃদ্ধি এবং অন্যত্র বেড়ে ওঠা নয়নতারা গাছদের মৃত্যুর ঘটনাকে 'প্রতীকী' বললেও এর গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি এরপর যে মন্তব্য করেছেন, তার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, সাহিত্যে মানব জীবন সম্পৃক্ত প্রসঙ্গসমূহ বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, শহীদুল জহির নিজে ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, সরকারের উচ্চপদস্থ সচিব এবং দায়িত্বসচেতন নাগরিক। সেকারণে রাষ্ট্রীয় হালহকিকত, প্রশাসনকাঠামো, কূটনীতি ও আমলাতন্ত্রের ফাঁকফোকর সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও অভিজ্ঞতা অনেক বেশি পরিণত ছিল।[৬] যে কথা সরাসরি বলা চলে না, তার সাহিত্যিক রূপায়ণের প্রয়োজনে লেখককে অবলম্বন করতে হয় রূপক, প্রতীক, সংকেত বা অন্য রূপকল্প। এ গল্পে জাদুবাস্তবতার প্রকরণে শহীদুল জহির এদেশের গড়পড়তা মধ্যবিত্ত কেরানির জীবনের চালচিত্র উপস্থাপনায় নতুনত্ব আনতে নয়নতারা ফুল, রাষ্ট্রব্যবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন, সরকারি কলোনিবাসীর অবরুদ্ধতা প্রভৃতি অনুষঙ্গকে প্রতীকী অর্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন, যার ব্যাখ্যা আমরা ইতঃপূর্বে করেছি। সমালোচক প্রতীকগুলোকে তাৎপর্যহীন বিবেচনার পাশাপাশি এসব ঘটনার সঙ্গে রূপকথার অবারিত কল্পনা ও বাস্তবতার অনুপস্থিতিকে সম্পৃক্ত করেছেন, যা আমাদের বিবেচনায় যথেষ্ট যুক্তিনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নয়।

'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' গল্পে ব্যক্তির অস্তিত্বসংকট রূপায়ণে লেখক সমকালীন বাস্তবতা ও আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে অবলম্বন করলেও এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে কিংবদন্তি ও রূপকথাগন্ধী আবহ। আকালু ও টেপির মতো ভূমিহীন হতদরিদ্র দম্পতির স্থান-সংকুলান গ্রাম থেকে শহরের মহল্লা দূরের কথা, এমনকি সেখানকার ছনের ঝুপড়িতেও যে হয় না এবং তাদের অস্তিত্বসংকট যে পারিপার্শ্বিক সমাজেরই সৃষ্ট এটিই এ গল্পের মৌল প্রসঙ্গ। আকালু ও টেপির জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন কাঠুরেবৃত্তি হলেও তাদের জীবনে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মূলে রয়েছে আর্থিক অনটন। অশিক্ষিত কাঠুরে আকালুর দিনযাপন ততদিন অন্তত স্বস্তিদায়ক ছিল, যতদিন কায়ক্লেশে তার সংসার চলত। নিজের বসতভিটা না থাকায় অনুমতি নিয়ে সিরাজগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের মিয়াদের ভিটায় সে স্ত্রীসহ দিনযাপন করে। নিঃসন্তান এই দম্পতির গতানুগতিক জীবনে ছেদ পড়ে অত্যন্ত নাটকীয় একটি ঘটনার অভিঘাতে। এক সকালে ভিটেমাটি সংলগ্ন আমগাছে দুটি দাঁড়কাক উড়ে আসার পর টেপি তাদের সঙ্গে আপনমনে আলাপচারিতা অব্যাহত রেখেছিল। তখন পাঙ্গাসিহাটের জব্বার আলির প্রস্তাবে ও স্ত্রীর অনুরোধে আকালু শহরের পাঙ্গাসি হাইস্কুল সংলগ্ন বটগাছটি কাটার প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হয়। খামখেয়ালি স্বভাবের আকালু অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কাজ করে। দাবিকৃত পারিশ্রমিকের চেয়ে কাজটি সম্পাদনগত পরিশ্রম অধিক হওয়ায় একপর্যায়ে সে উপলব্ধি করে — 'তার ঠকা হয়ে গেছে' (জহির, ২০০৭ : ৬৬)। গাছের গুড়ি চিরে লাকড়ি বানানোর এক পর্যায়ে গাছের গিঁটের অভ্যন্তরভাগে সে আবিষ্কার করে পলিথিনে মোড়ানো একটি ব্যাগ ভর্তি টাকার কয়েকটি বান্ডিল। আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত টাকা কীভাবে সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে এ ব্যাপারে তার ও তার স্ত্রীর ধারণা ছিল না। পরদিন সিরাজগঞ্জ শহরে গিয়ে সে অপরিচিত পান-সিগারেট বিক্রেতার পরামর্শ মেনে জনৈক উকিলের সঙ্গে যোগসাজশের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত টাকার প্রায় সবই হারায়; এমনকি অবশিষ্ট অর্থও রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় — রাতে তার বাড়িতে

আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া ডাকাতির ঘটনায়। এসব বৃত্তান্ত গ্রামবাসী বা পুলিশ জানলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে, এমন আশঙ্কাবশত রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে রাজধানী ঢাকাতে এসে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ে তারা অবতীর্ণ হয়। ঢাকায় পদার্পণমুহূর্তে তাদের জীবনে সংযুক্ত হয় নতুন নাটকীয় চমক। চান্দু নামক জনৈক রিকশাচালকের হারানো বাল্যবন্ধু জয়নাল হিসেবে আকালু সনাক্ত হওয়ার পর তারা তার কাছেই দয়াগঞ্জ বস্তিতে আপাতত থেকে যায়। কেননা, সম্পূর্ণ অপরিচিত এ শহরে আকালুর ছিল না কোনো পরিচিত মানুষ বা স্বজন। চান্দুর সহায়তায় রিকশা চালানো শিখে এর মাধ্যমে আকালু ও টেপির জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু নিঃসন্তান টেপির অন্তর্লোকে মাতৃত্বের অপূর্ণতাজাত শূন্যতার উপলব্ধিতে আনমনে একাকী কথা বলার প্রবণতা বেড়ে চলে। এক সকালে রেললাইনের পাশে খোলা প্রান্তরে বাঁশের মাথায় বসে থাকা একটি দাঁড়কাকের সঙ্গে টেপির কথোপকথনকে আকালু মেনে নিতে পারে না। কারণ তার ধারণা — 'এই কাক শালার ব্যাটা হারামি' (জহির, ২০০৭ : ৭৩)। পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্পর্কে অসচেতন ও সংস্কারাচ্ছন্ন এই যুবকের নিকট কাক যাবতীয় অমঙ্গল ও ভীতিবোধের প্রতীক। শহরের মানুষ অপেক্ষাকৃত বাস্তববুদ্ধিসচেতন, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সতর্ক, স্বার্থোদ্ধারের তাগিদে সুযোগকে সদ্ব্যবহারে কৌশলী, প্রয়োজনে শঠ ও প্রতারক। সুতরাং গ্রামের দরিদ্র মানুষের স্বভাবগত সততা ও সারল্য তাদের নিকট গুরুত্বহীন। তিনদিন পর আকালু জনৈক যাত্রী নিয়ে গন্তব্যস্থলে যাত্রাকালে উক্ত আরোহী তার প্রাপ্য ভাড়া পরিশোধের পূর্বেই আকস্মিকভাবে রিকশা থেকে নেমে গুলিস্তানগামী বাসে আরোহণকালে তার মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে যায়। সেটি কুড়িয়ে আকালু নিজের প্রাপ্য ভাড়া রেখে তারপর নারিন্দা পুলিশ ফাঁড়িতে জমা দেয়। কিন্তু তার সততা জনগণের রক্ষক হিসেবে খ্যাত পুলিশের নিকট যে মূল্যহীন, তা সে অচিরেই উপলব্ধি করে। নাগরিক জীবনের জটিলতার সঙ্গেও তার ছিল না পরিচয়। পূর্বোক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সে সিদ্ধান্তে স্থিত হয় — 'দাঁড় কাউয়ায় আমার পিছে নাইগছে, আর বাঁচপ না' (জহির, ২০০৭ : ৭৫); যা প্রকাশিত হয় চান্দুর নিকট তার স্বীকারোক্তিতে। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে 'একটা দাঁড়কাক একবার গ্রামে যায়া আমাক গ্রামছাড়া কইরছে, এহন ঢাহায় আইসা হাজির অইছে, আইজ আর এট্টু হইলে হাজতে গেছিলাম' (জহির, ২০০৭ : ৭৫)। সে বাস্তব জীবন, জগৎ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, জনমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অসচেতন বলেই নিজের প্রতিকূলতা সম্পর্কিত ঘটনা বা বিষয়কে দাঁড়কাকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এর ফলে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় — তার ভাগ্যে রয়েছে গ্রহগত প্রতিকূলতা ও দৈব দুর্বিপাক। আকালুর মতো নিয়তিবিশ্বাসী, বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত সরল মানুষের বৈষয়িক উন্নতি সেকারণে প্রায়শই ঘটে না। চান্দু আকালুকে নিয়ে রায়েরবাজারের ভাস্কর জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে 'সোলেমান বাদশার' দেশের নীলা কেনে শনির নজর কাটিয়ে তার জীবনের সকল বিপত্তি নিরসনের আশ্বাসে। তবু দুদিন পর তাকে নতুন বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। ভাস্কর জ্যোতিষীর সোকেস থেকে রত্ন চুরির অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের পর কারাগারে পাঠায়। স্বাভাবিকভাবেই এ পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার সামর্থ্য বা ভাবনা আকালুর ছিল না। কারণ সে মনে করে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে, সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত এবং সে যেন নিয়তির করায়ত্ত পুতুল। পুলিশ কারাগারে তাকে অন্তরীণ রাখলে সে টেপিকেও নিজের

কাছে রাখতে 'ডিউটি অফিসারকে বলে যে, চান্দুর সঙ্গে সেও চুরি করে এবং তাদেরকে এই চুরির বুদ্ধি দেয় তার স্ত্রী, টেপি' (জহির, ২০০৭ : ৭৬)। অপরাধী হিসেবে অভিযোগ অস্বীকারে অসমর্থ হওয়ায় তাদের দেড় বছর কারাভোগের সাজা দেয় আদালত। এরপর নির্বিঘ্নে কারাগারের চার দেয়ালের ঘেরাটোপে অতিক্রান্ত হয় চৌদ্দ মাস। পুনরায় আকালুর অস্তিত্বসংকট সৃষ্টি হয় দাঁড়কাকজাত ভীতিবোধের অনুষঙ্গে। কারাগারের যে কক্ষে তার অবস্থান, সেখানকার আলো-হাওয়া নির্গমনরত ফোকরে খড়কুটোসহ একটি কালো রঙের পাখির উপস্থিতি তার অন্তর্লোকে সঞ্চার ঘটায় বিপন্নতাগতবোধের, যা স্পষ্ট হয় কারারক্ষকের নিকট তার কক্ষ পরিবর্তনের কাতর অনুরোধে — 'আমাক বাঁচান ছার, এই কাউয়া আমাক শ্যাষ কইরা ফালাইব!' (জহির, ২০০৭ : ৭৭)। তবে তার এ বৃত্তান্ত কারারক্ষকের নিকট আষাঢ়ে গল্পের চেয়ে বেশি মূল্য না পাওয়ায় তার অনুরোধ রক্ষিত হয়নি। আকালুর মনোভুবনে দাঁড়কাক যে অমঙ্গলজনক ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তা অনুধাবন করা যায় কিছুদিন পর নিজ কক্ষে নিদ্রিত অবস্থায় একটি মূল্যবান পাথরবিশিষ্ট আংটি পাওয়ার পর এর মালিক হিসেবে আনন্দলাভের পরিবর্তে ভয় ও আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে সেটি আকালুর ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার ঘটনায়। আকালুর চেতনালোকে সংগুপ্ত ভীতিবোধ তাকে অবিরাম কীভাবে তাড়া করে চলে, উক্ত ঘটনা তারই দৃষ্টান্ত। কারাগারে শাস্তিভোগের নির্ধারিত মেয়াদ পরিসমাপ্ত হলে তারা কারারক্ষকের মালিকানাধীন মগবাজারের নয়াটোলার ফাঁকা জমিতে ঝুপড়ি গড়ে বসবাস ও এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পায়। টেপি সাংসারিক প্রয়োজনে অন্যের বাড়িতে ঝিগিরি করে। কিন্তু সেখানেও কয়েকমাসের ব্যবধানে আবির্ভাব ঘটে দাঁড়কাকের পালের। আকালুর চেতনালোকে ইতঃপূর্বে দাঁড়কাক বরাবর উপস্থিত ছিল অশুভ-অকল্যাণ, বিপদ ও প্রতিবন্ধকতার প্রতীকে। কিন্তু বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়ে অবশেষে সে নিজেই উপার্জিত অর্থ দিয়ে কাকের বসবাসের জন্য বাঁশের মাচা তৈরি করে। সময়ের পরিক্রমায় দাঁড়কাককুলের বংশবৃদ্ধিতে 'পত্রপল্লবহীন বৃক্ষশাখায় ধরা ফলের মতো আকালুর বাঁশের কাঠামো কালো কাকে ছেয়ে যায়' (জহির, ২০০৭ : ৭৯)। নয়াটোলার মহল্লাবাসী এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তারা প্রথম দিকে এ ব্যাপারে নির্বিকার থাকলেও পরবর্তীকালে ব্যাপারটার গূঢ়ার্থ অনুধাবনপূর্বক সচেতন হয়। এ পর্যায়েও আকালু ও টেপির অস্তিত্বসংকট ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে দাঁড়কাককুলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহল্লাবাসীর সঙ্গে এ দম্পতির সংঘাত সৃষ্টিতে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে এ পাখিরা। সময়ের ব্যবধানে আকালু দাঁড়কাকের বাসা ভেঙে যখন সাড়ে আঠারো মণ সাইকেলের স্পোক, লোহার তার, ইস্পাতখণ্ড বিক্রি করে, তখন মহল্লাবাসী এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার পরিণতিতে এক ধরনের ঈর্ষান্বিত মনোভাব তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এরপর সেটি চরম রূপ ধারণ করে যখন টেপি কাকের বাসায় পাওয়া একজোড়া সোনার দুল সেই মহল্লার ঝাড়ুদারনি নিমফল দাসীকে উপহার দেয়। ঘটনাটি অচিরেই জানাজানি হলে মহল্লার অনেকেই আকালুর অনুসরণে কবুতরের পরিবর্তে দাঁড়কাক প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়ে তাকে জানায় 'তুমি ঝাড়ু দারনীরে সোনার দুল দিছ, আমাগোও দেওন লাগব' (জহির, ২০০৭ : ৭৯)। এর জবাবে আকালু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে বলে — 'এহন নাই, পরে আবার পাইলে দিমু, এহন আপনেরা যান' (জহির, ২০০৭ : ৮০)। এভাবেই মহল্লাবাসীর সঙ্গে আকালু ও টেপির সম্পর্কে ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। উপর্যুক্ত ভাষ্যে প্রতীয়মান হয়, এ দম্পতির সঙ্গে

নয়াটোলার সমষ্টিমানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের স্বরূপ, যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আকালু ও টেপির অস্তিত্বগত বিপর্যয়। কেননা সমাজের তলদেশবর্তী মানুষ হয়েও তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমষ্টিমানুষের অন্তর্গত হতে পারেনি। রাজধানীর নাগরিক মহল্লাবাসীর কাছে গ্রামের আপাতসরল এবং অশিক্ষিত এ দুই নর-নারী 'অনেক চতুর এবং ধূর্ত' (জহির, ২০০৭ : ৮১) হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষ হিসেবেই মূলত, মহল্লাবাসীর সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আক্রমণাত্মক ও রক্ষণশীল। আকালু ও টেপি মহল্লাবাসীর বিবিধ আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ঝুপড়িতে আত্মগোপন করে। কয়েকজন আকালুর ঝুপড়িতে প্রবেশের প্রচেষ্টা চালালে দাঁড়কাককুলের আক্রমণে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। শুধু তাই নয়, দাঁড়কাকের ঠোকর খেয়ে 'তাদের ক্রোধ ভয়াবহ হয়ে ওঠে' (জহির, ২০০৭ : ৮০) বলে তারা ঝুপড়িতে আকালু-টেপিকে অবরুদ্ধ করে। অবরোধের আটাশতম দিন অতিবাহিত হলে তারা নিজ গৃহে ফিরে যায়। ত্রিশতম দিন পেরিয়ে দিবাগত রাতে মহল্লাবাসী আকালুর গৃহদাহের আয়োজন সম্পন্ন করায় দাঁড়কাককুল বসতি ছেড়ে উড়ে যায়। পরদিন ভোরে আক্রমণকারীরা ঝুপড়িতে প্রবেশ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তারা সেখানে সোনার গহনা অথবা আকালু-টেপিকে পায় না। এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের নাটকীয় ও রহস্যজনক অন্তর্ধান সম্পর্কে অতি দ্রুতই পল্লবিত হয় একাধিক কিংবদন্তি। নয়াটোলাবাসীর একদল মহল্লায় প্রচার করে — 'কাকেরা তাদের বাঁশের আড়া ছেড়ে উড়ে যাওয়ার সময় আকালু এবং টেপিকে ঠোঁটে করে নিয়ে যায়' (জহির, ২০০৭ : ৮১)। মহল্লাবাসীর কাছে আকালু ও টেপির পরিচিতি ছিল বহিরাগত, গ্রাম্য, অশিক্ষিত ও ধুরন্ধর মানুষ হিসেবে। সেই সঙ্গে কাককে প্রতিপালন এবং এদের মাধ্যমে উক্ত দম্পতির গহনা প্রাপ্তির ঘটনা মহল্লাবাসীকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছিল। এ ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে যে সামাজিক বাস্তবতা, তা হলো — বৈষম্যপূর্ণ বাঙালি সমাজের অন্তেবাসী মানুষের উপস্থিতি রাজধানী তথা দেশের কেন্দ্রভাগে অস্বীকৃত, অগ্রহণযোগ্য। অর্থ, বিত্ত ও সম্পদের লালসা কীভাবে তাদের মনুষ্যত্ববোধকে অবনমিত করে, তা স্পষ্ট হয় উক্ত দম্পতির ঝুপড়িতে তাদের আগুন ধরিয়ে দেয়ার ঘটনায়। লেখক জাদুবাস্তবতার আধারে আকালু-টেপির পরিণতিকে রহস্যের পর্দায় আড়াল করলেও পাঠকের বাস্তবনিষ্ঠ বিবেচনা অনুযায়ী, তাদের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের ঘটনাটিই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। জীবিত বা মৃত, কোনো অবস্থাতেই এ দম্পতির স্থান হয়নি নয়াটোলায়। সিরাজগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম থেকে রাজধানী ঢাকার দয়াগঞ্জের বস্তি, কারাগারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে নয়াটোলার ঝুপড়ি — কোথাও তারা পায়নি মানুষ হিসেবে ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদা। তাই পাখিসমাজে ঘৃণ্য ও অবহেলিত দাঁড়কাককুলের সঙ্গেই তাদের গড়ে তুলতে হয় সখ্য এবং তাদের সঙ্গে মানবসমাজ থেকে এ দম্পতির প্রস্থান ঘটে। এ গল্পে বিন্যস্ত ঘটনার পরিণতি যত অবিশ্বাস্যই প্রতিভাত হোক না কেন, আকালু-টেপির মতো মানুষ যে সামাজিক পরিচয়ে বৃহত্তর সমাজে লাঞ্ছিত ও মনুষ্যেতর পর্যায়ভুক্ত, সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শিকড়উন্মূলিত — এ সত্যের বিকল্প প্রতিবেদন অন্তত এ গল্পে লেখকের অভীপ্স নয়। তাদের অস্তিত্বসংকট এ বৈষম্যপূর্ণ অসমবিকশিত সমাজেরই সৃষ্ট, যার পরিণতি নিঃসন্দেহে হতাশাব্যঞ্জক। এ গল্পের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ, সংশয়গ্রস্ত মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন —

'কাঠুরে ও দাঁড়কাক' গল্পের সূচনা বাক্যাংশ 'ঢাকা শহরের প্রবীণ অধিবাসীরা স্মরণ করতে পারে যে, বহুদিন পূর্বে ঢাকা শহর একবার কাকশূন্য হয়ে পড়ে' প্রথমেই যে রকম বানানো তেমনি গল্পের কেন্দ্র চরিত্র কাঠুরে আকালু ও তার স্ত্রী টেপিকে নিয়ে (লেখক) যে রূপকথা ফাঁদেন, তা রূপকথাই থেকে যায়, তার ভিতরার্থ বড় বেশি আরোপিত মনে হয়। বাস্তব জ্ঞান শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে লাগে না। (রশীদ, ২০১০ : ৪১)

আবদুল আন্নান সৈয়দ যেহেতু এ গল্পের প্রথম বাক্যেই রূপকথার স্বাদ আস্বাদন করেন, তাই এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসন্ধানের জন্য আকালু ও টেপির জীবনবাস্তবতাকে তিনি গুরুত্ব দিতে অনাগ্রহী। তাঁর মন্তব্যে রয়েছে গল্পের বাস্তব পটভূমি ও সমকালীন প্রসঙ্গসমূহকে অগ্রাহ্য করে আকালু-টেপি দম্পতির দাঁড়কাককুলের সঙ্গে রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারে অবিশ্বাস, এ ঘটনার সংগুপ্ত তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যাপারে নিরাসক্তি।

'কাঁটা'[৭] গল্পে ধর্মীয় বিভাজন বা সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও জাতিগত বিভেদ, মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের সহায়তায় পুরাতন ঢাকার জনজীবনে সঞ্চারিত বিপন্নতা, ভারতের অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙার ইতিবৃত্ত, মৌলবাদের উত্থান, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের আত্মরক্ষার দুর্বার তাগিদে একাত্মবোধক মানবিক আচরণ প্রভৃতি সংবেদনশীল প্রসঙ্গের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে এ গল্পে লেখক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কালপরিসরকে অবলম্বন করেছেন, যার ব্যাপ্তি ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে শুরু করে ১৯৯২ সালের (৬ ডিসেম্বর) ভারতের অযোধ্যার বাবরি মসজিদের ধ্বংস-পরবর্তী কয়েক মাস। (জাদুবাস্তবতার আবহ ও কাঠামোতে) এক হিন্দু দম্পতির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধারাবাহিকভাবে তিনবার ভূতের গলির বাসিন্দা হিসেবে আবির্ভাব, প্রতিবেশী মহল্লাবাসীর সঙ্গে ধর্মীয় দূরত্ববোধের পরিবর্তে তাদের সম্প্রীতিময় আচরণ, আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপরায়ণ মনোভঙ্গি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে সংঘটিত একাধিক রাজনৈতিক ঘটনার বিষবাষ্পে তাদের শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, এতদঞ্চলের সমষ্টিমানুষের অস্তিত্বগত টানাপড়েনের চালচিত্র। (কখনো তা নিছক উক্ত দম্পতিকে ঘিরে, কখনো বা তাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ মহল্লাবাসীর সংঘাতের পরিণতিতে।) সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সাধারণ মানুষের প্রত্যাশিত হলেও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজনের পর সেটিই হয়ে উঠেছিল তাদের অধরা স্বপ্ন। এ গল্পে লেখক নিপুণ কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তির অস্তিত্বহীনতা ও মৃত্যুর অন্তরালে সমষ্টিমানুষের অন্তর্লোকে ক্রিয়াশীল অপরাধবোধ ও আত্মগ্লানির পীড়ন, ভয়াবহ অতীতকে বিস্মৃত হতে না পেরে বরং বারবার সেদিকেই পশ্চাদ্ধাবনের মতো অস্বস্তিকর প্রসঙ্গসমূহ, যার পরিণতিতে তাদের অস্তিত্বময়তাই হয়ে ওঠে নারকীয় বিভীষিকাস্নাত। কৃতকর্মের পরিণতি সাধনে সমষ্টির ভূমিকা কখনো বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্রেক ঘটায়, যার অন্তরালে কার্যকর থাকে মানুষে মানুষে বিভাজনের সেই চিরাচরিত মানদণ্ড। এর ভিত্তিতে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায়ভিত্তিক খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন ভাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে যে অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেটিই এ গল্পের উপজীব্য। এ গল্পের ঘটনাবিন্যাসরীতি ও পরিস্থিতিসমূহ অনেকটাই বিশৃঙ্খল, এলোমেলো এবং একটি ঘটনাপ্রবাহে সংযুক্ত হয়েছে অন্য ঘটনার স্রোত। লেখক সমাজপটের

উপরিভাগে সংঘটিত ঘটনারাশির সমান্তরালে মহল্লাবাসীর সমষ্টিচেতনায় সন্নিহিত প্রতিক্রিয়া, তাদের মনোভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। পুরাতন ঢাকার ভূতের গলিতে স্বপ্নারানী দাস ও সুবোধচন্দ্র দম্পতির আবির্ভাবের মাধ্যমে এ গল্পের ঘটনাস্রোতে প্রবহময়তার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৬৪ সালের পরিপ্রেক্ষিতে বিন্যস্ত হয়েছে এ পর্যায়ে সংঘটিত ঘটনাসমূহ। যখন নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে এ দম্পতি ভূতের গলির বাসিন্দা হয়েছিল, তখন ঢাকার কোনো কোনো এলাকায় চলছিল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এহেন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে সুবোধচন্দ্র-স্বপ্না দম্পতির কুয়ার গহীনে সলিল সমাধির যে বিবরণ গল্পে উপস্থিত, তা বিশেষ তাৎপর্যবহ। যে বাড়িতে তারা ভাড়াটে হিসেবে এসেছিল, সেখানে ছিল একটি পাতকুয়া। বর্ষার মৌসুমে কুয়াটি পানিপূর্ণ হওয়ার পর রাতের আকাশে প্রজ্জ্বোলিত পূর্ণিমার চাঁদের অসামান্য সৌন্দর্যস্নাত প্রতিবিম্বের হাতছানি তাদের মোহাবিষ্ট করেছিল। লক্ষণীয়, এ দম্পতির আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে সামগ্রিক প্রতিবেশের বর্ণনায় কিছু প্রতীকী বর্ণানুষঙ্গ প্রযুক্ত —

> সুবোধচন্দ্র এবং তার কালো তরুণী স্ত্রী কুয়োর পানিতে ভেসে ওঠা পূর্ণিমার চাঁদ ধরতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়। ... বর্ষার দিনে কোনো এক রাতে ঘুম না আসায় সুবোধচন্দ্রের স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে কুয়োপাড়ে মুক্ত বাতাসে গিয়ে দাঁড়ায়; তখন ক্রমাগত বৃষ্টির কারণে কুয়োর পানি খুব উপরে উঠে এসেছিল এবং সে রাতে আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। মহল্লার লোকেরা এই কথা শুনতে পায় যে, সেদিন রাতে কোনো এক সময় কুয়োতলায় সুবোধচন্দ্র তার স্ত্রীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং তারা কুয়োর শান-বাঁধানো পাড়ের ওপর বসে গল্প করে, তখন তাদের তরুণ বয়স এবং প্রকৃতির আনন্দময় উন্মোচনের কারণে হয়তোবা তাদের উচ্ছ্বাস হয়। সেসময় হাতের প্রায় নাগালের ভেতর কুয়োর পানির দিকে তাকিয়ে স্বপ্না একটি গোল সোনার থালার মতো চাঁদকে পানির ভেতর ডুবে থাকতে দেখে। মহল্লার লোকেরা বলে যে, কুয়োর ভেতর এই চাঁদের দিকে তাকিয়ে স্বপ্না যখন বলে, ধরি, তখন সুবোধচন্দ্র বলে, ধরো এবং ... তার পরেই এই ঘটনা ঘটে। (জহির, ২০০৭ : ১২৩)

এ ঘটনা সংঘটনের পটভূমিতে রয়েছে মাঝরাতের আলো-আঁধারিলগ্ন আবছায়া পরিবেশে বিচ্ছুরিত পূর্ণিমার আলো এবং বৃষ্টিস্নিগ্ধতা। কিন্তু লক্ষণীয়, ঘটনাটি সংঘটনের স্থলপট হলো সেই পাতকুয়া, যেটি বর্ষার জলে প্লাবিত। সেই অন্ধকার কুয়ার জলে পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেটি মৃত্যুগহ্বর হিসেবে উক্ত দম্পতির কাছে বিবেচিত হয়নি। বরং এমন এক বিভ্রান্তিকর মোহময়তা সেটিতে জড়িয়ে ছিল যে এর জলে প্রতিবিম্বিত আকাশের অধরা চাঁদ উক্ত দম্পতির কাছে হয়ে উঠেছিল হাতে ধরা যায়, আপন করে কাছে পাওয়া যায় এমন এক আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতিরূপ। আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা বাস্তব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চকিতে নিজের অবস্থান ভুলে আকাশের চাঁদকে হাতে পেতে চাওয়ায় ঘটনাটির অন্তিম পরিণতি তাদের জন্য চরম বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। অন্ধকার কুয়ার কালো জলে স্বর্ণোজ্জ্বল চাঁদের প্রলুব্ধকর ও দ্যুতিময় বিচ্ছুরণ সৌন্দর্যপিপাসু মানুষকে সম্মোহিত করতে সমর্থ হলেও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ জানে — এই সৌন্দর্য বস্তুবিয়োজিত, অধরা। তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। কিন্তু সুবোধ ও স্বপ্না প্রণয়াবেগের উন্মাদনায় সেই বিমূর্ত সৌন্দর্যকে বস্তুতুল্য বিবেচনায় এক মুহূর্তের অসচেতনতাবশত হাত বাড়িয়ে নিজেদের পতন ঘটিয়েছিল। ঘটনাটি সংঘটনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে তাদের

অস্তিত্বসংকটের প্রসঙ্গ। নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে পুরাতন ঢাকার ভূতের গলিতে এই দম্পতির আগমন যে তাদের স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নিরাপদ, তা জোরালোভাবে দাবি করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে। ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্বয়ের স্বাধীন অস্তিত্বের অন্তরায় ও হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিভেদের মূলে যতই ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের কূটচাল ও ষড়যন্ত্রকে দায়ী করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের চারিত্র্যেই সন্নিহিত ছিল অন্যের বিরুদ্ধে নিজেকে জয়ী হিসেবে দেখার সুতীব্র অভীপ্সা। মুসলমান অধ্যুষিত ভূতের গলিতে আবির্ভূত হবার পর সুবোধ-স্বপ্না দম্পতি অনুধাবনে সমর্থ ছিল, ঢাকা শহরের কোনো কোনো এলাকায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। সেহেতু, ধর্মীয় পরিচয়গত কারণে সংখ্যালঘু হিসেবে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হয়ে হীনম্মন্যতাবোধে আক্রান্ত হওয়া এ দম্পতির জন্য অস্বাভাবিক নয়। কুয়ার প্রতীকে লেখক এ ঘটনায় সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন সেই অবিভক্ত পাকিস্তানকে, যেখানে অসাম্প্রদায়িকতা রূপ পূর্ণিমার অধরা চাঁদের জন্য সাধারণ মানুষের আকুতি রয়েছে, অথচ এর বাস্তবায়ন তখন অসম্ভব। সেকারণেই তাদের পক্ষে ধর্মীয় বিভাজন এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা কার্যকর হয়নি। জীবন ও মৃত্যুর সমান্তরালে প্রকৃতির সাহচর্যে উক্ত দম্পতির উচ্ছ্বাস ও কুয়ার নিকট গমন, সোনার থালার মতো চাঁদের কুয়ার অন্ধকার জলে ডুবে থাকায় প্রতীয়মান হয় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ভয়াবহতা, যা ব্যক্তিমানুষের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনে অবরুদ্ধতার প্রতীক। স্বপ্না ও সুবোধের মতো সংখ্যালঘু মানুষের সেই অন্ধকার গহ্বরের সামনে হাত বাড়াতে গিয়ে জীবনদানের ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক পরিচিতির কারণে মানুষের প্রতি মানুষের যে সহজাত মমত্ববোধ ও উদারনৈতিক জীবনদৃষ্টি, তাতে আস্থা স্থাপনের অসামর্থ্য, অন্যদিকে দূরদর্শিতার অভাবে নিজের অস্তিত্বগত বিনাশ। অর্থাৎ সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ধর্মের যূপকাষ্ঠে বলি হওয়ার বাধ্যবাধকতা সংখ্যালঘু মানুষের ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য ছিল। নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে মুসলমান অধ্যুষিত ভূতের গলি তাই তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারেনি, বরং তাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। শুধু এ বেদনাময় ঘটনা নয়, বরং আরেকটি প্রতীকী ঘটনাও এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন লেখক। সেটি হলো, হিন্দু রীতি অনুযায়ী গৃহকর্ত্রীর তুলসী গাছের বেদিতে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের বিষয়টি। এটি স্বপ্না মান্য করত। সেকারণেই আব্দুল আজিজের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে সে একটি তুলসী গাছ মাটিতে রোপণ করে সেটির গোড়ায় বৃত্তাকারে সিঁদুরের গুড়া ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু উক্ত দম্পতির মৃত্যুর পর যত্নের অভাবে তুলসী গাছটিও প্রাণহীন হওয়ায় স্পষ্ট হয় সংখ্যালঘু মানুষের অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ।[৮] যতদিন স্বপ্না শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য গাছটিতে পানি দিত, ততদিন সেটিও ছিল জীবন্ত, সজীব। উক্ত দম্পতির মৃত্যু ঘটায় পরিচর্যার অভাবে সেটিও হয়ে যায় অস্তিত্বহীন। ১৯৬৪ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে দাঙ্গা কবলিত ঢাকা শহরে একটি সংখ্যালঘু হিন্দু দম্পতির কুয়াগহ্বরে নির্মম মৃত্যু যে নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং তৎকালীন সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বগত বিপন্নতারই প্রতীক, উক্ত ঘটনার প্রতীকার্থে এই সংবেদনশীল প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতির অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হওয়ার প্রথম অশুভ লগ্ন ছিল ২৫ মার্চের কালোরাত। পুরাতন ঢাকার মুসলমান অধ্যুষিত ভূতের গলিতে একটি হিন্দু পরিবার হিসেবে সুবোধ ও স্বপ্না দম্পতির আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা জনমনে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর বিভেদ প্রসঙ্গকে পুনরায় সামনে নিয়ে আসে। সেই বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই যখন নিজেকে রক্ষায় মরীয়া, তখনো এতদঞ্চলের মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একাত্মতাবোধ অটুট ছিল। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে উক্ত দম্পতির সঙ্গে তাদের প্রতিবেশীদের প্রাত্যহিক দিনযাপনে, কুশল বিনিময়ে, আতিথ্যে, চরম বিপন্ন মুহূর্তে সহাবস্থান ও প্রাণ বাঁচানোর জন্য আশ্রয় দানের ঘটনায় — 'তারা তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চায় এবং বলে, আমরা আছি না, আমরা মইরা গেছি নিহি' (জহির, ২০০৭ : ১১০)। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সকালে আত্মগোপনের জন্য মহল্লা ছেড়ে উক্ত দম্পতির জিঞ্জিরায় পলায়ন, দুদিনের ব্যবধানে বাসস্থলে তাদের প্রত্যাবর্তন, নিজের গ্রামে ফিরে যাবার আগ্রহ সত্ত্বেও পরিস্থিতিগত প্রতিকূলতা প্রভৃতি ঘটনা সংঘটনের সমান্তরালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ পর্যায়ে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বগত টানাপড়েনই মুখ্য হয়ে ওঠে। নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতিবোধ, আতঙ্ক ও অস্থিরতার সামষ্টিক চাপে পিষ্ট হয়েও এ পর্যায়ে মহল্লাবাসীর সঙ্গে সুবোধ-স্বপ্নার পারস্পরিক হৃদ্যতা, আন্তরিকতা অটুট ছিল। ধর্মীয় ভেদাভেদ ও সাংস্কৃতিক ব্যবধানের পরিবর্তে মানবিক বিবেচনা ও শ্রেয়বোধ তাদের আলাপচারিতাতেই শুধু নয়, বরং ব্যবহারেও ফুটে উঠেছিল — 'তারা বলে, ডরান ক্যালা, আমাগো যা হইব, আপনেরও হইব, আমরা বাঁচলে আপনেও বাঁচবেন' (জহির, ২০০৭ : ১১১)। জীবন বাঁচাতে সনাতন বাঙালি নারীসমাজে প্রচলিত সধবা নারীর আচরণের চেয়ে তখন স্বপ্নার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রাণে বেঁচে থাকার অন্তর্তাগিদ। সেকারণেই কপালের সিঁদুর মুছে ও হাতের শাখা খুলে স্বপ্না এবং সুবোধ টুপি মাথায় দিয়ে যখন কলেমা মুখস্থ করে, তখন অনুধাবন করা যায় সংখ্যালঘু হয়ে বেঁচে থাকার হীনম্মন্যতাবোধ তাদেরকে প্রতিনিয়তই কতটা বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগকে নির্দ্বিধায় যে জলাঞ্জলি দিতে সক্ষম, এ উপলব্ধি উক্ত দম্পতির চেতনালোকে প্রোথিত হয় পারিপার্শ্বিক নগ্ন বাস্তবতার অভিঘাতে। প্রতিবেশী মুসলমানদের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার ঘটনাটি সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধতার প্রতিক্রিয়াজাত হলেও এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও অনুরূপভাবে একই সংকটবৃত্তে নিমজ্জিত ছিল। হয়ত পাক হানাদার বাহিনী ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান বলে ভূতের গলির মহল্লাবাসী কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল, কিন্তু মোটাদাগে বিষয়টি যখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সামরিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য কায়েমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তখন আক্রান্ত মহল্লাবাসীর অস্তিত্বসংকট অনায়াসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সুবোধ-স্বপ্না দম্পতির প্রতি তাদের সমুদয় আশ্বাস ও সান্ত্বনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি যখন ঘোলাটে ও অস্থির হয়ে ওঠে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশী দোসর, রাজাকার, শান্তি কমিটির মতো সংগঠনের দৌরাত্ম্যে, তখন ক্রমশই প্রকটিত হতে থাকে ভূতের গলির মানুষের অস্তিত্বসংকটের রূপরেখা। আবুবকর মওলানার অনুসারী রাজাকারদের উৎপাতে ভীত সুবোধ-স্বপ্না প্রাণ বাঁচাতে 'সহজ নামায শিক্ষা বই' থেকে চার কলেমা মুখস্থ করে। কিন্তু তারা জানে, এভাবে

কৌশল অবলম্বন করে দিনের পর দিন পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের অনুচরদের হিংস্র করালগ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। মহল্লাবাসী এ নির্মম বাস্তবতা অনুধাবনে সমর্থ হলেও সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি তাদের সাহস যোগাতে 'আমরা তো আছি', এই কথা তারা আর বলতে পারে না। 'এই অবস্থায় তারা বলে, আল্লাহ ভরসা' (জহির, ২০০৭ : ১১৩)। তবুও দুর্বিষহ রূঢ় বাস্তবতার সংঘটনে ভিন্নতা ঘটে না, সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব ভূতের গলি থেকে বিলীন হয়ে যায় রাজনৈতিক কূটচালের নিয়মে। ঢাকার মহল্লা ছেড়ে হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাতে অন্যত্র সরে পড়লেও সুবোধ-স্বপ্না দম্পতি সেক্ষেত্রে অপারগ ছিল। রাজাকার ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আবুবকর মওলানা খবর পেয়েছিল, ভূতের গলিতে একটি হিন্দু পরিবার বাস করছে। আর একবার যদি তাদের ছবি ছাপানোর জন্য পাক হানাদার বাহিনীর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে তার পোয়া বারো। সেকারণেই সে অস্ত্রসজ্জিত পাকসেনাদের নিয়ে ভূতের গলিতে হাজির হয়। এমতাবস্থায় নিজেদের রক্ষার জন্য মহল্লাবাসী বাড়ির ছাদে চাঁদতারা খচিত সবুজ এবং সাদা রঙের পতাকা উড়িয়ে পাকিস্তানের প্রতি কৃত্রিম অনুরাগের বহিঃপ্রকাশে সচেষ্ট হলেও তাদের প্রচেষ্টা প্রশ্নবিদ্ধ হয় পাকসেনাদের সঙ্গে লম্বা জোববা পরিহিত আবুবকর মওলানার অপতৎপরতায়। হিন্দু দম্পতির অনুসন্ধানের জন্য সে মহল্লাবাসীর কলেমা মুখস্থ শোনার পরীক্ষা চালায়। ইসলামী ধর্মপ্রীতির পরিচয় পেতে তারই ইন্ধনে মহল্লার সাদা টুপি পরিহিত একচল্লিশ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে একসারিতে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মুখস্থ কলেমা আবৃত্তির আদেশ দেয়া হয়। এ পর্যায়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সুবোধ সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে রক্ষায় সমর্থ হয় মুখস্থ বিদ্যা কাজে লাগিয়ে। ফলে, ভূতের গলিতে হিন্দু দম্পতির অনুসন্ধানে আবুবকর মওলানাকে আপাতত নিরস্ত হতে হয়। রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনের ফলে আবুবকর মওলানা উক্ত মহল্লায় হিন্দু দম্পতিকে অনুসন্ধানের পরিবর্তে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করতে তৎপর হলেও তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কেননা তার অনুসারীদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসন্ধান মহল্লাবাসীর সহায়তা ব্যতীত অসম্ভব ছিল। আর, মহল্লাবাসী যে এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করবে না, তার পক্ষে এমন ধারণা পোষণ সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতান্তই স্বাভাবিক। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজাকার আবুবকর মওলানার নিকট এক হিন্দু দম্পতির চেয়ে প্রতিপক্ষ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহল্লার যুবকদের অনুসন্ধান অধিক জরুরি হয়ে ওঠে। কারণ ইতোমধ্যেই ভূতের গলিতে বসবাসরত পাঁচটি পরিবারের ছেলেরা গোপনে মুক্তিযুদ্ধে গেছে, এরূপ খবর প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু আবুবকর মাওলানার অনুগত রাজাকারদলের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি মূলত তাদের অদূরদর্শিতা এবং কৌশলগত নৈপুণ্যের অভাবে। সেকারণে রাজাকার নেতা আবুবকর মাওলানা আরো বেশি মরীয়া হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য। এ পর্যায়ে সুবোধচন্দ্রের হিন্দু হিসেবে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জীবন যে নাটকীয়তায় ভরপুর, এবং এর অভিঘাত যে মুহূর্তের ব্যবধানেই চলমান পরিস্থিতিকে বদলে দিতে পারে, এমন বিস্ময়কর ঘটনার সূত্রপাত ঘটে এক শুক্রবারে। জুম্মার নামাজের পর মহল্লার এগারোজন লোক সুবোধচন্দ্রের বাড়িতে উপস্থিত হয়, সুবোধ-স্বপ্নাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব কি না, সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য। কিন্তু তখন আকস্মিকভাবেই আবুবকর মওলানা পাকসেনাদের নিয়ে সদলবলে

উপস্থিত হয়। তারা মহল্লা ঘেরাও করে রাখায় আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে জড়ো হওয়া ব্যক্তিরা পাকসেনাদের ভয়ে পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সেখানে মিলাদ পড়া শুরু করলে আত্মগোপনের প্রচেষ্টায় সুবোধও টুপি পড়ে তাদের দলে যোগ দেয়। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পরও তাদের মিলাদ সমাপ্ত না হওয়ায় একপর্যায়ে পাকসেনারা তাদের থামায়। মুক্তিযোদ্ধাদের খবর বের করতে আবুবকর মওলানা তৎপর হলেও তার প্রচেষ্টা সফল হচ্ছিল না। তবে অনেকটা নাটকীয়ভাবেই সে হিন্দু হিসেবে সুবোধের খোঁজ পায়, কারণ আবদুল আজিজের বাড়িতে দেয়ালের কাছে সে তুলসী গাছটি দেখতে পায়। ফলে একজন হিন্দুকে আড়াল করতে গিয়ে এ পর্যায়ে মহল্লার মুসলমানরা আবুবকর মওলানাকে অস্বীকার করতে গিয়ে বলে 'কি কন আপনে হিন্দুরা মিলাদ পড়ে নিহি'? (জহির, ২০০৭ : ১২০) আবুবকর মওলানার ধূর্ত চোখ ফাঁকি দেয়া মহল্লাবাসীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই সে যখন জানতে চায় তুলসী গাছের পূজা করে কে, তখন তারা অনুধাবন করে, স্বপ্নার হাতের শাখা ভেঙে সিঁদুর মুছে ফেলার প্রচেষ্টা হয়ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। তাই যখন 'তারা বলে যে তুলসী গাছ হয়তো এমনি এমনি হয়েছে, ... আবুবকর মওলানা এ কথা বিশ্বাস করে না' (জহির, ২০০৭ : ১২০)। এভাবে হিন্দু ব্যক্তিকে অন্বেষণে সফল না হয়ে আবুবকর মওলানার পরামর্শে পাকসেনারা সুবোধচন্দ্রসহ পূর্বোক্ত বারো জন পুরষকে আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির ভেতরের প্রাঙ্গনে কুয়ার পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে কলেমা মুখস্থ বলার পরীক্ষা নেয়। এতে সবাই উত্তীর্ণ হওয়ায় আবুবকর মাওলানা তখন পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে তাদের মুসলমানিত্বের (সুন্নত বিষয়ক) প্রমাণ চায়। এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবেই মহল্লাবাসীর কেউ একজন (সম্ভবত যে সুবোধের পাশে দাঁড়িয়েছিল) তাকে জাপটে ধরে কুয়ার নিচু পাঁড়ের ওপর দিয়ে ঠেলে ভেতরে ফেলে দেয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় হতভম্ব দুজন পাকসেনার বন্ধুকের গুলিতে আবদুল আজিজ ব্যাপারির কুয়াতলায় তিনজন মহল্লাবাসী গুলি খেয়ে এবং সুবোধচন্দ্র কুয়ায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ভীতি, আতঙ্ক, লজ্জা, বিপন্নতাবোধ ও মৃত্যুর সমন্বিত অভিঘাতে মহল্লাবাসীর জীবন যে পরাভব ও গ্লানি, অন্তর্দাহের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহ এর সাক্ষ্যবহ। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শোকবিহ্বল মহল্লাবাসী মৃতদের লাশ নিয়ে আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ি ত্যাগ করার পর প্রবল শোক ও বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় নিপতিত হয়ে তারা সুবোধচন্দ্রের কথা ভুলে যায়, যার পরিণতিতে আরেকটি বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে। সেদিন বিকেলে মৃতদের দাফন করিয়ে বাড়িতে ফেরার পর সুবোধচন্দ্রের মৃতদেহের কথা তাদের মনে পড়ায় তারা পুনরায় আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে যায়, কিন্তু ঘরে তারা স্বপ্নাকে দেখতে পায় না। তার বিছানার ওপর ভাঙা শাখা এবং সিঁদুর রাখার খোলা ওল্টানো কৌটা দেখে তারা সমগ্র ব্যাপারটি অনুধাবন করে। এরপর কুয়ার ভেতর দড়ি বেঁধে হুক নামানো হলে সুবোধ-স্বপ্নার জোড়া লাশ উঠে আসে। এ ঘটনার পরিণতিতে 'মহল্লার লোকেরা সেদিন বিমর্ষ, বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত বোধ করে, তারপর সুবোধচন্দ্রের কথা মহল্লার লোকেরা নানা ঝামেলার ভেতর ভুলে থাকে যতদিন পর্যন্ত না সাতক্ষীরা থেকে তাকে খুঁজতে লোক আসে' (জহির, ২০০৭ : ১২১)। দেশ স্বাধীন হবার এক বা দুই মাস পর স্বপ্নার ছোট ভাই পরানের উপস্থিতি মহল্লাবাসীর

অবচেতনলোকে সন্নিহিত সেই দম্পতির বেদনাদায়ক ইতিবৃত্ত পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বপ্নার ব্যবহৃত শাখার ভাঙা টুকরোগুলো ছিল সিঁদুর মাখানো। সেই নারী ও তার প্রিয়জনের রক্তাক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণার্তি উক্ত প্রতীকের আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পরান নিজের পরিচয় মহল্লাবাসীকে না জানালেও তার সম্পর্কে মহল্লাবাসী অবহিত ছিল। কেননা তারা অনুমান করতে পেরেছিল স্বজনহারা এই বিষণ্ন যুবক মৃত দম্পতির পরিবারের ঘনিষ্ঠ কেউ হবে। পরানের নিরাসক্ত, ব্যথাসিক্ত দৃষ্টির অন্তরালে ঘৃণা, শোক, প্রতিহিংসা বা অন্য কোনো মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ না ঘটলেও মহল্লাবাসীর সমষ্টিমানসে এ অপরাধবোধ ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠেছিল যে, তারা সুবোধ ও স্বপ্নাকে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রক্ষায় অসমর্থ। হিন্দু বলেই মূলত, মহল্লায় উক্ত দম্পতির অবস্থান প্রতিনিয়ত ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, যার খেসারত তাদের দিতে হয়েছে জীবনদানের মাধ্যমে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বসংকটের ভিন্ন প্রতিবেদন এ গল্পে পুনরায় বিবৃত হয় আরেকটি নৃশংস ঘটনার মাধ্যমে। ধর্মের মতো সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ সামাজিক মানুষকে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে। তাই তখন তার সামাজিক পরিচয় নির্ণীত হয় জাতি, গোষ্ঠী, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে, অপেক্ষাকৃত খণ্ডিত পরিসরে। এর প্রভাব জনসমাজে এতটাই প্রবল ও সক্রিয় যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের একের প্রতি অন্যের মনুষ্যত্ববোধ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও মতাদর্শের কাছে বিভিন্নভাবে পরাভূত হয়। হিন্দু বলেই মুসলমান অধ্যুষিত ভূতের গলিতে সুবোধ-স্বপ্না দম্পতিকে পুনরায় আরেকটি অপ্রীতিকর ঘটনার ভয়াবহ শিকার হতে হয়। ভারত উপমহাদেশ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের কালপর্বে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক তিনটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পেলেও ধর্মীয় ভেদাভেদের বিষবাষ্প এ উপমহাদেশের মানুষকে সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির শৃঙ্খলে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। সেকারণেই ভারতের অযোধ্যায় নব্বই দশকের প্রথমদিকে বাবরি মসজিদ বিধ্বস্ত হয় সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের অপতৎপরতায়। এ ঘটনা ভূতের গলিতে প্রচারিত হলে মুসলমান মহল্লাবাসী সুবোধচন্দ্রকে সাহস যোগায়। কারণ ঘটনাটির প্রতিক্রিয়ায় উক্ত দম্পতি বিচলিত হয়ে পড়েছিল প্রাণরক্ষার ব্যাপারে। যদিও সুবোধ একদিন 'ইয়োর চয়েস সেলুনে' চুল কাটার সময় ম্লানমুখে বলেছিল 'এইগুলো কোনো কাম না, মসজিদ ভাঙলেই কি ধর্ম হয়?' (জহির, ২০০৭ : ১২৫) তবু তার সম্পর্কে মহল্লায় কিছুদিনের ব্যবধানেই একটি গুজব রটানো হয় যে, সুবোধ ও স্বপ্না বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার খবর শুনে উল্লসিত হয়ে আনন্দে মিষ্টি খেয়েছে। এ ঘটনা যেদিন প্রচারিত হয়, সেদিন মহল্লায় প্রচলিত গুজবের বাস্তব ভিত্তি উন্মোচিত হয় — 'দুদিন পরে সংবাদপত্রে যখন মসজিদের এই ধ্বংসস্তূপের ওপর বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাত উপরের দিকে ওঠানো, মাথায় পাগড়ি জড়ানো মৌলবাদীর ছবি ছাপা হয়' (জহির, ২০০৭ : ১২৫), তখন তারা অসহায়বোধ করে এবং সেদিন তারা সুবোধ সম্পর্কিত উক্ত গুজবকে সত্য হিসেবে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এরপর সুবোধ-স্বপ্না সম্পর্কিত উক্ত ঘটনার যথার্থতা যাচাই করার প্রয়োজন তারা অনুভব করেনি। বরং মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে নিজেদের মুসলমানিত্বের প্রমাণ দিতে তারা উক্ত দম্পতির প্রতি ক্ষেপাটে পশুসুলভ আচরণ করে। মিষ্টি খাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কেউ না জানলেও মহল্লাবাসী

'পরে বলে যে 'এই খবরের উৎস হয়তো ছিল আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির চাকর অথবা চাকরানি অথবা অন্য কেউ' (জহির, ২০০৭ : ১২৫)। এ ঘটনার পরিণতিতে ধর্মীয় উন্মাদনা ও বিভ্রান্তির শিকার 'মহল্লাবাসীর এক বিরাট দল আবদুল আজিজের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে' (জহির, ২০০৭ : ১২৬)। তারা যখন সেই বাড়ি পরিত্যাগ করে তখন মৃত অবস্থায় সুবোধ-স্বপ্নাকে কুয়ার ভেতর পড়ে থাকতে দেখা যায়। এরাই একসময় উক্ত দম্পতিকে বিপন্ন পরিস্থিতিতে আশ্বাস দিত 'ডরায়েন না'। সেই আশ্বাসের ভিত্তিমূল টলে গেলে সংখ্যালঘু মানুষের অস্তিত্ব কীভাবে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মীয় আগ্রাসনের মদমত্ততায়, তার দৃষ্টান্ত এ নিহত দম্পতি। ঘটনাটি জানাজানি হলে কুয়া থেকে মৃতদের লাশ নিতে পুলিশ দলবলে এগিয়ে এলেও জোড়াখুনের দায়ে মহল্লাবাসীকে তারা গ্রেফতার করেনি। লেখক এ গল্পে তেমন কোনো ভাষ্য উপস্থাপন করেননি, যা থেকে পাঠক ধারণা করতে পারে যে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে জান-মাল রক্ষার জন্য প্রণীত আইন-কানুন যথাযথভাবে প্রশাসন-সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে কার্যকর হচ্ছে। সেকারণে মহল্লাবাসীর মধ্যে যারা অপরাধী, তাদের অনুসন্ধানের জন্য কোনো ধরনের উদ্যোগ পুলিশের পক্ষ থেকে নেয়া হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মহল্লাবাসীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের সাহস ও আন্তরিকতার অভাব পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে প্রকটিত করলেও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জনমনে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কারণ ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত পরিচয়টি যেখানে একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিভাজনে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, সেখানে মানবাধিকার, অপরাধ, হত্যাকাণ্ড, শাস্তি, আইন প্রভৃতি শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কার্যকারিতা হারাতে বাধ্য। উক্ত দম্পতির এভাবে নিহত হওয়ার ঘটনা পুনরায় প্রমাণ করে, ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মূলনীতি হলো — ধর্মের জন্য মানুষ, মানুষের জন্য ধর্ম নয়। সেকারণে কাগজে কলমে আইনের পরিভাষায় লিখিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রাপ্য নাগরিক অধিকারের বাস্তবায়ন জনজীবনে প্রায়শই কার্যকর হয় না। ইসলাম ধর্মে মানুষ হত্যা কখনোই অনুমোদিত বা সমর্থিত নয়। অথচ ভিন্ন রাষ্ট্রের মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় উল্লসিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মিষ্টি খাওয়ার ঘটনা আদৌ সত্য কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই দুজন মানুষকে এভাবে পশুর মতো হত্যা করার মূলে রয়েছে ধর্মীয় অন্ধত্ব ও কূপমণ্ডূকতা। হত্যা, জিঘাংসাবৃত্তি ও পাশবিকতাকে যারা অন্তর থেকে উপড়ে ফেলতে পারে না, তারা যে ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শকে প্রতিনিয়ত কলঙ্কিত করছে, এ উপলব্ধি ভূতের গলির বাসিন্দাদের নেই। তবে এ গল্পে লেখক বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপন করেছেন। ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান হয়েও যারা ইসলামের আদর্শ ও নীতি অগ্রাহ্য করে, তাদের প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপবোধের বিষয়টিকে তিনি উপেক্ষা করেননি। তিনি দেখিয়েছেন, তারা পরকালভাবনায় শঙ্কিত হয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট নতচিত্তে কৃতকর্মের জন্য ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করছে না; কিন্তু বিবেকের দংশন বা নৈয়ায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কৃতকর্মের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে বাধ্য। যারা সুবোধ-স্বপ্নাকে হত্যা করেছিল ধর্মীয় মূল্যবোধে বলীয়ান হয়ে, একসময় তাদের ভেতর স্বাভাবিকভাবেই অপরাধবোধ জাগ্রত হয় কৃতকর্মের জন্য। কারণ মৃতদের প্রাণদান তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনুতপ্ত চিত্তে তারা এর প্রতিকারার্থে আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে প্রবেশ করে কোদাল দিয়ে কুয়াটি

মাটিচাপা দিতে চায়, যেন একই ভুলের পুনরাবৃত্তি তারা আবার না করে বসে। এ ঘটনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, সুবোধ-স্বপ্না দম্পতি ভূতের গলিতে নিছক তাদের প্রতিবেশী ছিল না। বরং ধর্মীয় পরিচয়সূত্রে তারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মহল্লাবাসীর সঙ্গে দিনযাপন করতে গিয়ে বারবার উত্থাপন করেছে এমন কিছু নীরব প্রশ্ন, যেগুলো তাদের অস্তিত্ব, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রীয় অধিকার-সংশ্লিষ্ট। এসবের সদুত্তর মহল্লাবাসীর নিকট ছিল না। উনিশশ চৌষট্টি ষালের দাঙ্গার পটভূমিকায় কুয়ায় উক্ত দম্পতির প্রাণপাত, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ অথবা বিরানব্বইয়ের বাবরি মসজিদকেন্দ্রিক ঘটনা — সবগুলোরই পরিণতি ছিল এ সংখ্যালঘু দম্পতির অস্তিত্বহীন হওয়া। এসব ঘটনা মহল্লাবাসীর সমষ্টিচেতনায় যে অপরাধবোধের জন্ম দেয়, এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের বিবেচনা ও যুক্তিবোধ ভারসাম্য হারায়। কেননা তাদের মৃত্যুর সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা মহল্লাবাসী অস্বীকার করতে পারে না। এর পরিণতিতে উনিশশ চৌষট্টি সাল থেকে নব্বই দশকের কালপর্বের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের তালগোল পাকিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে যায়। সেকারণেই 'তারা সময়ের কোন তলে আছে তা তারা বুঝতে পারে না' (জহির, ২০০৭ : ১২৬)। আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির কুয়াটিই এ পর্যায়ে হয়ে ওঠে তাদের সমুদয় সমস্যার সমাধানকেন্দ্র। এটিকে মাটি চাপা দিলেই সুবোধ ও স্বপ্না আর মৃত্যুবরণ করবে না — এমন ভাবনায় স্থিত হয়ে তারা চিন্তাকে কার্যকর করে। কিন্তু এরপরও চেতনালোকে সন্নিহিত অপরাধবোধ ও কৃতকর্মের বিভীষিকাময় স্মৃতিকে তারা বিস্মৃত হতে পারে না। বরং বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যে ব্যবধান, চেতনালোকের সেই প্রাচীর ছিন্ন হওয়ায় তারা ক্রমশই দিশেহারা হয়ে পড়ে। এভাবেই লেখক এ গল্পের পরিসমাপ্তি অংশে দেখিয়েছেন যে, অপরাধের প্রতিকারার্থে আইনের প্রয়োগ না ঘটলেও পুরাতন ঢাকার ভূতের গলির বাসিন্দারা তাদের জীবনে চলমান ঘটনাসমূহের অভিঘাতে এ পর্যায়ে মানসিক পীড়নের শিকার হয়। কেননা এর যথোপযুক্ত প্রতিবেশ তাদেরই সৃষ্ট, যার মূলে রয়েছে ধর্মীয় অন্ধত্ব এবং সংখ্যাগুরুর আগ্রাসী মনোভঙ্গি। সুবোধ ও স্বপ্নার স্মৃতিময় উপস্থিতি তাদের নিকট বিব্রতকর হয়ে উঠলেও তারা তাদের অস্তিত্ব অস্বীকারে অসমর্থ। কুয়াটি মাটি চাপা দেয়া হলেও আবদুল আজিজ ব্যাপারির বাড়ির প্রাঙ্গণে রোপিত তুলসী গাছ ও কুয়াটি তাদের সমষ্টিমানসে প্রবলভাবে অস্তিত্বময় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তুলসী গাছটি সুবোধ-স্বপ্না দম্পতির ধর্মনিষ্ঠার এবং কুয়াটি সংখ্যালঘু হিসেবে বিজাতীয় সংখ্যাগুরুদের দ্বারা তাদের নির্মমভাবে প্রাণদানের প্রতীক। সংঘটিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় ভাবোন্মাদনার অন্ধকার কুয়ায় আবদ্ধ হয়ে সুবোধ-স্বপ্নার হত্যাকারীরা হারিয়ে ফেলে জীবনের সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা। সেই দুঃস্বপ্নের জগতে তারা অবরুদ্ধ বলেই 'বিভ্রান্তির ভেতর তাদের এরকম মনে হয় যে, তারা হয়তো কোনো এক জায়গায় কোনো এক স্বপ্নের ভেতর আটকা পড়ে আছে এবং এই স্বপ্নের ভেতর তারা অতীত থেকে ভবিষ্যতে অথবা ভবিষ্যত থেকে অতীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে এবং তাদের মনে হয় যে, সুবোধ ও স্বপ্নার বিষয়টি হয়তো সত্য নয়, স্বপ্ন'। (জহির, ২০০৭ : ১২৭) তাদের ধারণা ও বাস্তবতার মধ্যে অসীম ব্যবধান প্রসঙ্গে লেখক সমগ্র গল্পেই বারবার জানিয়েছেন — যে বিশৃঙ্খলার চক্রে তাদের দিশেহারা পরিভ্রমণ অবিরাম চলতে থাকে সময়ের স্রোতকে উল্লম্ফনের মাধ্যমে, তার মূলে কার্যকর রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় সংকীর্ণমনস্কতা, সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক হঠকারিতার

সম্মিলিত নেতিবাচক অভিঘাত। সেকারণেই হিন্দু ও মুসলমানের অস্তিত্বসংকট বহিরাগত পাকসেনাদের দ্বারা পর্যুদস্ত হওয়ার আশঙ্কায় যারা সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে এসেছিল, তারাই মসজিদ ধ্বংসের আনন্দে মিষ্টি খাওয়ার গুজবকে চরম সত্য ভেবে এক অন্যকে পশুর মতো হত্যা করে। বাঙালি জাতির অন্তর্গত দুই প্রধান ধর্মগোষ্ঠীর এ রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবোধ যে তাদের আবহমানকালের শাশ্বত মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রধানতম কাঁটা, সে ভাবনারই প্রাতিস্বিক শিল্পরূপ এ গল্প। আহমদ মোস্তফা কামালের অভিমত —

> কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এই বিভ্রান্তির? লক্ষণীয় বিষয় যে, (সুবোধ-স্বপ্নার) এই কুয়োর মধ্যে পড়ে যাবার ঘটনাটি তিনবার ঘটে তিনটি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময় ... এই পড়ে যাওয়া বা ফেলে দেওয়া আসলে মহল্লাবাসীর মনোজগতেই ঘটে। একটি সম্প্রদায়ের মনোজগতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ এমন সংগোপনে লুক্কায়িত থাকে যে, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় সেটি প্রকাশিতই হয় না, প্রকাশিত হয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সময়। নিজেদের অবচেতন মনের এই বিষয়টি বুঝতে পারে না বলে এই গল্পের অসহায় চরিত্রগুলো, বিষণ্ন বোধ করে, অপরাধবোধে ভোগে। (রশীদ, ২০১০ : ১৭৯)

সমালোচকের এ অভিমতের সঙ্গে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। তার মতে, সুবোধ ও স্বপ্নাকে যে তিনবার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কুয়ার গহ্বরে মৃত্যুবরণ করতে হয়, এ ব্যাপারটি আদৌ বাস্তবে ঘটেনি, বরং সেগুলো ভূতের গলির বাসিন্দাদের কল্পিত। যদি মহল্লাবাসী আদৌ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্পর্কে এমন ভাবনায় ভাবিত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এর একটি বাস্তব পটভূমি থাকতে হবে। কেননা, এটি কোনো একক ব্যক্তির অবচেতনলোকের যথেচ্ছ ভাবনা নয়, বরং সমষ্টিগত মহল্লাবাসীর ভাবনা। তাছাড়া, বাস্তবে যে ঘটনা সংঘটিত হয়, তারই অভিঘাত মানুষের অবচেতনে সংগুপ্ত থাকে। যদি একথা আমাদের মানতে হয় যে সমগ্র ঘটনাটি সমষ্টিবাসীর অবচেতনের কল্পনা, তাহলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে হবে, এ মহল্লায় ১৯৬৪ সালের পূর্বে কোনো হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। যার নির্মম পরিণতির অভিঘাতে মহল্লাবাসীর সমষ্টিচেতনায় পরবর্তীকালে সুবোধ-স্বপ্নাকে নিয়ে এ ধরনের ভয়াবহ পরিণতিজনিত ভাবনার উদয় হয়েছে। কিন্তু সমগ্র গল্প নিবিড়ভাবে পাঠ করেও আমরা তেমন কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ করি না। সুবোধ-স্বপ্নার মৃত্যুর বিষয়টিকে তখনই মহল্লাবাসী গুরুত্ব দেবে যদি এর বাস্তব ভিত্তি থাকে। অর্থাৎ এসব ঘটনা ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৩ সালের পটভূমিতে সংঘটিত হয়েছে বলেই মহল্লাবাসী তিনটি ঘটনার অভিঘাতে পরবর্তীকালে তাদের চেতনালোকের শৃঙ্খলা হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, জন্মসূত্রে, পারিবারিক পরিচয়ে মুসলমান হয়েও মহল্লাবাসীর অনেকেই ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শ ভুলে (আল্লাহর মহত্ত্ব স্মরণ করে) সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনায় পৈশাচিকভাবে সংখ্যালঘু নিধনে মেতে ওঠে। এর পরিণতিতে তারা সুবোধ-স্বপ্না সংক্রান্ত অপরাধবোধে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তিনটি ঘটনা সংঘটনের পটভূমি অবশ্যই সমাজ-ধর্ম-রাজনীতিযুক্ত বাস্তবতার শর্তবন্দি এবং সমালোচক কথিত মহল্লাবাসীর মনোজাগতিক ভাবনাও মিথ্যা গুজবের ভিত্তিতে সুবোধ-স্বপ্নাকে বলপূর্বক কুয়ায় ফেলে হত্যার প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত।

'আমাদের বকুল' গল্পে পরিবার ও সমাজে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল অবস্থানে বিপন্ন নারীর অসহায়ত্বের সমান্তরালে তার ওপর পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যশীল মানসিকতার রূঢ় বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়, যার পরিণতিতে নারীসত্তা সম্ভাবনাহীন, এমনকি অবলুপ্ত হয়ে যায়। আবহমান বাংলার চিরাচরিত গ্রামীণ জীবনের যে প্রশান্তি ও প্রাকৃতিক মাধুর্যের খ্যাতি বাঙালি সমাজে সুবিদিত, তারই বিপ্রতীপ চিত্র এ গল্পে নারীর অস্তিত্বগত বিপন্নতার সূত্রে উপস্থিত। প্রকৃতি ও নারীর অদ্বৈত ভাবমূর্তি প্রতীকী আবহে এ গল্পের প্রতিপাদ্যকে তাৎপর্যবহ মাত্রায় উন্নীত করেছে। সুহাসিনী গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুর আকালু ফাতেমাকে বিয়ে করায় গ্রামের কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মধ্যে ঈর্ষাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে, যার মূলে রয়েছে তার নববিবাহিতা স্ত্রীর অনিন্দ্য যৌবনদীপ্ত সৌন্দর্য। সংসারের সব কাজেই ফাতেমা কুশলী হলেও গ্রামবাসীর পরশ্রীকাতরতার প্রতিক্রিয়ায় আকালুর মধ্যে ক্রমশ হীনম্মন্যতাবোধ জেগে ওঠে। তার বিবেচনাহীন আচরণের প্রতিক্রিয়ায় সময়ের ব্যবধানে তাদের দাম্পত্যজীবনে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত গাভীটি একবছর পরও গর্ভধারণ না করার পাশাপাশি আকালুও ইতোমধ্যে সন্তানের জনক না হওয়ায় গ্রামবাসী ফাতেমা ও তার আনা গাভীটির ব্যাপারে কুৎসা রটায়। এর প্ররোচনায় আকালু স্ত্রী ফাতেমাকে অকারণেই অভিযুক্ত করে 'তর বাপের দেওয়া এই গাইয়ের নাহাল তুইও বাঞ্জা ম্যায়া নোক নাতো, তখন ফাতেমা অপমানে দুঃখে চুপ করে থাকে' (জহির, ২০০৪ : ৩১)। কারণ যে পুরুষ স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণে অনাগ্রহী ও অবিবেচক, তাকে বোঝানোর সামর্থ্য ফাতেমার নেই। স্ত্রীর প্রতি অশ্লীল সম্বোধন, শ্বশুরের প্রতি অযৌক্তিক অভিযোগ প্রভৃতি ঘটনায় প্রকাশিত হয় সংসারে ফাতেমার মর্যাদাহীন, লাঞ্ছিত জীবনের স্বরূপ। তবে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে আকস্মিকভাবেই ফাতেমার কাজলা গাই ও তার একই সময়ে গর্ভবতী হওয়ার ও যমজ সন্তান প্রসবের ঘটনায়। উপর্যুক্ত ঘটনাসমূহে লেখক সচেতনভাবেই জাদুবাস্তবতাকে প্রয়োগ করেন এ উদ্দেশ্যে যে, যখন নারীর নিকট কোনো প্রত্যাশার বাস্তবায়ন ঘটে, তখনই উন্মোচিত হয় তার প্রতি পরিবার ও সমাজের প্রকৃত রূপ। এমতাবস্থায় 'আকালুর শুধু একার নয়, সুহাসিনীর সকল লোকের বিস্ময় হয়, তারা আকালুকে বলে, ক্যারে, তর হশুরতো দেখি ভাল, তক ভাল ম্যায়া দিছে, ভালই গাই দিছে, দুই জন একই রকম দেইখতে, আবার দুইজনেই একসঙ্গে দুইখান কইর‍্যা বাচ্চা দেয়' (জহির,২০০৪ : ৩২)। একসময়ে যে নারী ও গাভীর সন্তান ধারণে অক্ষমতার দোহাই দিয়ে আকালুর নিকট তার শ্বশুরের প্রতারণার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল গ্রামবাসী, এখন তাদের মুখেই ঠিক বিপরীত কথা শোনা যায়। এবং এটিও তাদের প্রকৃত মনোভঙ্গি নয়। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারীর প্রতি তাদের চিন্তায় পুনরায় প্রতিধ্বনিত হয় কদর্যতা, কামনাসিক্ত নোংরামির। সেকারণেই আকস্মিকভাবে একদিন (সম্ভবত) গ্রামবাসীর চৌর্যবৃত্তির পরিণতিতে ফাতেমার কাজলা গাই ও দুটি বাছুর হারিয়ে যায়। এরপর সমাজ ও সংসারের প্রতি অভিমানবশত সন্তানের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করে সেই নারীও হয়ে যায় নিরুদ্দিষ্ট। এমতাবস্থায় গ্রামবাসীর সংশয় ও শ্লেষ-বিদ্রূপের খোঁচায় স্ত্রীর প্রতি আকালুর অসহিষ্ণুতা প্রকটিত হয় — 'এই মাগির নেইগা তিনট্যা দিন নষ্ট কইরল্যাম, কাম কইরলে একশ/দেড়শ ট্যাহার কাম করা যাইতো! ...পাইলে কি রাইখ্যা আসি, শালির বিটির চুলের মুঠ ধইর‍্যা নিয়া

আইসত্যাম না!' (জহির, ২০০৪ : ২৬)। ফাতেমার প্রতি আকালুর মনোভঙ্গি কতটা তাচ্ছিল্যকর ও অবমাননাজনক — এ সংলাপে তা বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে সহজেই অনুমেয়। ফাতেমাকে অনুসন্ধানে আকালুর সকল প্রচেষ্টাই অসার প্রতিপন্ন হওয়ায় অবশেষে গ্রামবাসীর সন্দেহের তালিকায় সংযুক্ত হয় গ্রামের মসজিদের প্রাক্তন মুয়াজ্জিন, দাখিল শ্রেণির ছাত্র রফিকুল ইসলামের নাম, যে ফাতেমার প্রতি বড় বোনের মতো শ্রদ্ধাশীল। অবশেষে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেও ফাতেমার হদিশ পাওয়া আকালু বা গ্রামবাসীর পক্ষে সম্ভব হয় না। লক্ষণীয়, ফাতেমার নিরুদ্দেশের সঙ্গে তার গাভী হারানোর সাদৃশ্য অনুধাবনপূর্বক গ্রামবাসী পুনরায় যে ভাবনায় আত্মনিবিষ্ট হয়, তাতেও সন্নিহিত থাকে নারীর প্রতি পুরুষের কামলোলুপ দৃষ্টিভঙ্গি। কাজলা গাই ও তার দুই বাছুর হারানোর ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে ফাতেমার অন্তর্ধান মূলত সমাজ-সংসার-পরিবারের প্রতি তার চরম বিতৃষ্ণ মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ, এবং এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত তাকেই নিতে হয়েছে। কেননা স্ত্রী হিসেবে সে স্বামীর কাছে কখনোই প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা পায়নি। এমনকি একজন নারীর জন্য সবচেয়ে সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ অর্থাৎ মাতৃত্বের ব্যাপারেও তাকে পরিবার ও সমাজে চরমভাবে অপমানিত হতে হয়। ফাতেমা এ সমাজকে নীরবে প্রত্যাখ্যান করেও তার নারীসত্তার অবমাননা থেকে নিস্কৃতি পায় না। কারণ, গ্রামবাসীর ধারণা হলো, হয়তো অর্থের প্রলোভনে আকালু তাকে সিরাজগঞ্জে পতিতাপল্লিতে বিক্রি করেছে। অর্থাৎ অন্তিম বিবেচনায় নারীর মূল্য পুরুষতন্ত্রের নিকট মানুষ হিসেবে নয়, পুরুষের কামবহ্নি প্রশমিত করাতেই যেন তার নারীজন্মের সার্থকতা নিহিত! ফাতেমার অবুঝ দুই মাতৃহীন সন্তানকে সান্ত্বনা জ্ঞাপনের জন্য একদা গ্রামের বৃদ্ধ ইমাম মোহসিন আলি বিচিকলার একটি চারা আকালুর ভিটার পিছনে লাগিয়েছিল। চারাটি যখন বর্ষায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তখন সেটির সুগোল ও স্ফীত গুড়ি, সুগঠিত ও সতেজ পত্রপল্লবের বিস্তারদৃশ্য তাদের অবচেতনলোকে বারবার জাগিয়ে তোলে ফাতেমার যৌবনদীপ্ত দেহবল্লরীর অনিন্দ্য স্মৃতি। নারী ও প্রকৃতির অভিন্নতাকে রূপায়ণের লক্ষ্যে লেখক গ্রামবাসীর স্মৃতিচারণায় এভাবে জাদুবাস্তবতাকে পরিচর্যিত করেছেন। এক্ষেত্রে এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ফাতেমার উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী কন্যা বকুলের যৌবনের চারিত্র্য অনুযায়ী নারীত্বের প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে পুনরায় তার সঙ্গে উক্ত বৃক্ষের দেহসুষমাগত সাদৃশ্য আবিষ্কারের ঘটনায়। এভাবেই বকুল, ফাতেমা ও তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে রোপিত কলাগাছের আপাত সাযুজ্যে গ্রামবাসীর চেতনায় নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধগম্য হলেও তা যে নিতান্তই আপেক্ষিক, সে বিষয়টিকে লেখক নির্দেশ করেছেন নাটকীয়ভাবে লাল পিঁপড়ার ঝাঁকের আক্রমণে বকুলের মৃত্যুর ঘটনায়। হয়তো এ ঘটনা উক্ত গল্পের সচেতন পাঠকের নিকট যতটা বিস্ময়কর, ততটা যুক্তিনিষ্ঠ বিবেচিত হয় না; তবু বকুলের সম্ভাবনাশূন্য-অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও আশাহীনতাকে রূঢ়ভাবে উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে লেখক তার এ ভয়াবহ, বীভৎস মৃত্যুকে রূপায়িত করেন। কারণ বাংলাদেশের গ্রামীণ আবহে প্রতিষ্ঠিত রক্ষণশীল ও সংকীর্ণমনস্ক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ফাতেমার চেয়ে বকুলের ভবিষ্যৎ পরিণতি ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই অলীক ভাবনা। সুহাসিনী গ্রামের মাটিতে রোপিত 'সবুজ, সবল এবং কান্তিময়' (জহির, ২০০৪ : ৩৮) বিচিকলার ঝোপে আশ্রয় গ্রহণকারী লাল পিঁপড়ার ঝাঁকের বকুলের মতো

উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীকে এক রাতের অন্ধকারে 'খেয়ে' যাওয়ার প্রতীকার্থে লেখক ফাতেমার মতোই সেই নারীর পরিণতিকে নিষ্ফল ও তাৎপর্যহীন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পুরুষতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে নারীর অবমাননা, এমনকি মৃত্যুবরণের মাধ্যমে অস্তিত্বহীন হওয়ার বাধ্যবাধকতা যে বংশপরম্পরায় এদেশের গ্রামীণ সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে, সেই নির্মম বাস্তবতাকে এ গল্পে লেখক পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শহীদুল জহিরের ছোটগল্পে বাঙালি সমাজের নিম্নবর্গ ও গড়পড়তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাত্যহিক দিনযাপন, তাদের জীবিকা, বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ ও অস্তিত্বসংগ্রাম বাস্তবতার পটভূমিতে উপস্থাপিত। ধর্মীয় পরিচয়, সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমন্বিত অভিঘাত তাদের জীবনযাত্রাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সেখানে কখনো বিচ্ছিন্ন, কখনো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গ্রাম, শহর, রাজধানী, মহল্লা ও বস্তির পরিসরে তাদের অন্তর্ভাবনা ও জীবনবাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধের নিপুণ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কে বিদ্যমান অনন্বয় ও বিচ্ছিন্নতাবোধ পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে, এমনকি প্রিয়জন থেকেও কখনো কখনো তাদের বহুদূরে সরিয়ে দেয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে অপরিচিত মানুষেরাও হার্দ্যিক আহবানে সাড়া দিয়ে হয়ে ওঠে পরস্পরের নিকটজন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশকের কালপরিসরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক হঠকারিতার পটভূমিতে রচিত বক্ষ্যমান পাঁচটি ছোটগল্পে সমষ্টিমানুষের আচরণে সক্রিয় দূরত্ববোধ ও একাকিত্ব, সামাজিক জীবনের অবক্ষয় ও নৈরাজ্য, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বসংকট রূপায়ণে লেখক অভিনিবিষ্ট। বেঁচে থাকার অহর্নিশ অন্তর্তাগিদ সত্ত্বেও অস্তিত্বের নিরন্তর টানাপড়েনই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এসব গল্পের কুশীলবদের জীবনের অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. বরেণ্য কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের মূল্যায়ন —
'লেখক নামে যে মানুষটি থাকে, জীবনযাপন করে, কাজে যায়, সেই মানুষ শহীদুল কোনোদিন আত্মপ্রকাশ করেননি। সঙ্গোপনে জীবনযাপন করেছেন তিনি, চলেও গেছেন প্রায় সকলের অজান্তেই। শুধু তাঁর লেখাগুলো যেভাবে নিঃসংকোচে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বাংলা সাহিত্যে বিনা আড়ম্বরে একটা শক্ত মজবুত আসন দাবি করেছিল, সেই দাবি এখন অনপেক্ষ প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। ... বাংলাদেশের সাহিত্যে একেবারেই আলাদা একটা জায়গা থেকে — সমাজ-বীক্ষণ, ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজ আর সমাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি — শুরু করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। শহীদুল জহির হয়ে ওঠেন তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি। তবে উত্তরসূরি, তার বেশি কিছু নয়, ধ্বনি প্রতিধ্বনি নয়, এক নতুন ওয়ালীউল্লাহ নয় বরং ওয়ালীউল্লাহর ভেতর দিয়ে এক শহীদুল জহির, মৌলিক, ছাপিয়ে যাওয়া, চূড়ান্ত স্বতন্ত্র এবং শহীদুল।' (রশীদ, ২০১০ : ২৫-২৭)

২. নিজের লেখালেখির জগতে প্রবেশ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে শহীদুল জহির জানিয়েছেন —
'স্কুলে পড়ার সময় থেকেই লেখার অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল। তবে সামান্যই লিখেছি তখন। হয়তো এটা আব্বার কাছ থেকে পাওয়া। তিনি লিখতেন কিন্তু বই প্রকাশ করা হয়ে ওঠেনি। ...

আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়েছিল বিচিত্রায় ১৯৭৪ সালে, একটা ছোটগল্প। আমি ডাকযোগে পাঠিয়েছিলাম। ছাপবে কিনা নিশ্চিত ছিলাম না, তবে তারা ছেপেছিলেন। কিন্তু আমার নামটা বদলে তারা নাম দিলেন — একটি ফুল একটি আশা। তারপর পূর্বাণী পত্রিকায়ও একটা লেখা ছাপা হয়, নাম ছিলো 'উড়াল' — প্রায় উপন্যাস আকারের। মূলত এই দুটি লেখাই আমাকে লেখার জগতে টেনে আনে।' (রশীদ, ২০১০ : ৬১০)

৩. সমালোচক মুহম্মদ সবুর জানিয়েছেন —

'আত্মমগ্ন থাকাও জীবনের এক ধাঁচ। কারো কাছে অবশ্য বিসদৃশ মনে হলেও একেকজন একেক রকমই বলতে গেলে। কম কথা বলার মানুষটি যে ভেতরে ভেতরে পরিশীলিত একজন কথাকার, তা বোঝার সুযোগ মিলত না। ... সামাজিকতা যে ছিল না, তা নয়। তবে তা সীমিত পর্যায়ে। নিজেকে পড়াশোনা আর লেখালেখির মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিলেন বলে অনেক সঙ্গ আর সংঘে যাবার আগ্রহ ছিল না। ...সতীর্থদের অনেকেই জেনেছেন তিরোধানের পর যে, তাদের সহপাঠী বা সহকর্মী শহীদুল হক একজন বরেণ্য কথাশিল্পী এবং তারও রয়েছে পাঠককুল। কথাশিল্পী শহীদুল জহির আর ব্যক্তি শহীদুল হক যে একই এমন ধন্দেও পড়েছেন সতীর্থদের অনেকেই। ব্যক্তি জীবন আর পেশাগত জীবনকে একাকার করে 'মুড়ি-মুড়কি এক দর' করার প্রবণতা ছিল না বলেই সবার মাঝে থেকেও ছিলেন নিজের মাঝে; নিজস্ব ভুবনে।' (রশীদ, ২০১০ : ৬০-৬১)

লেখকের পরিচিতজন জাহানারা পারভীন জানিয়েছেন —

'যতদিন বেঁচে ছিলেন (শহীদুল জহির) যাপন করেছেন প্রকৃত লেখকের জীবন। তার লেখার মতো নিজেও ছিলেন যেন একটু আলাদা। প্রকৃত অর্থেই নিভৃতচারী। সাহিত্যের আড্ডা, সভা সমিতি, মিডিয়ার কোলাহল সবকিছু থেকে আড়ালে সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে। পরিচিত অনেকে, সহকর্মী, এমনকি প্রতিবেশীরাও জানতেন না তার লেখালেখির কথা। (তিনি) শহীদুল হক ও শহীদুল জহিরের বাহ্যিক সীমানা প্রাচীরকে সব সময় জিইয়ে রেখেছেন।' (রশীদ, ২০১০ : ৩০৬)

৪. এ প্রবন্ধে 'অস্তিত্ব' শব্দটিকে আমরা 'অস্তিত্ববাদ' (Existentialism) নামক পাশ্চাত্যপ্রভাবিত দর্শনের আলোকে ব্যবহার করিনি। বরং অভিধানে প্রচলিত 'অস্তিমান' বা 'বিদ্যমান থাকা', 'টিকে থাকা' প্রভৃতি শব্দের প্রায়োগিক বিবেচনা অনুযায়ী বলা যায়, সামাজিক প্রাণী হিসেবে মানুষ পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে (রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে) নিজেকে টিকিয়ে রাখতে অবিরাম যে লড়াই অব্যাহত রাখে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত, এর সমার্থক হিসেবে শব্দটিকে আমরা গ্রহণ করেছি। বাংলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সবচেয়ে সফল রূপকার হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। তাঁর রচিত *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮) উপন্যাসদ্বয়ে, *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬২) ও *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩) নাটকে, *নয়নচারা* (১৯৪৫) ও *দুই তীর ও অন্যান্য গল্প* (১৯৬৫) গল্পসংকলনদ্বয়ের অন্তর্গত একাধিক ছোটগল্পে অস্তিত্ববাদী জীবনজিজ্ঞাসা প্রাতিস্বিক শিল্পভাষ্যে উত্তীর্ণ। শহীদুল জহির রচিত কোনো ছোটগল্পেই উক্ত দার্শনিক ভাবনাকে সচেতনভাবে অবলম্বন করা হয়নি। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে বাঙালি জনজীবনসম্পৃক্ত যে চালচিত্র কথাসাহিত্যে উপজীব্য করেছেন, সেখানে সাধারণ খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনচর্যা, বেঁচে থাকার অন্তহীন প্রয়াস ও অস্তিত্বসংকটের প্রসঙ্গ অবধারিতভাবেই উপস্থিত। গ্রাম বা শহর, রাজধানীর বস্তি বা পুরাতন ঢাকার মহল্লা — যে স্থানিক পরিমণ্ডলকে এবং এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত কুশীলবদের তিনি ছোটগল্পে রূপায়িত করুন না কেন, সেক্ষেত্রে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন দেশ, সমাজ, সমকাল, জীবিকা সম্পর্কে অস্তিত্বসংগ্রামরত মানুষের অভিরুচি, মূল্যবোধ ও জীবনজিজ্ঞাসাকে। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক বা দার্শনিক বীক্ষাকে নেপথ্যে রেখে ছোটগল্প রচনায় পরিণতমনস্ক শহীদুল জহির আগ্রহী ছিলেন না। প্রথম গল্পগ্রন্থ *পারাপারে* তিনি মার্কসীয় সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আস্থাশীল থাকলেও পরবর্তীকালে সেই অবস্থান থেকে তিনি সরে এসেছিলেন।

৫. 'কলোনি' শব্দের গূঢ়ার্থে সমীর রায়চৌধুরী 'জবরদখলের ঐতিহাসিক ধারণা'র উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। তিনি এর উদাহরণ দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, বিজিত এলাকায় রোমান সৈন্যের ছাউনি বা গ্রিসে বহিরাগত বাসিন্দাদের স্থায়ী এলাকা নৌশক্তির বিকাশের পর সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের পরিণতিতে বিজিত নতুন অঞ্চলের শাসনপ্রণালির সঙ্গে 'কলোনি' শব্দের অর্থগত সম্পৃক্ততা ঘটেছে (সমীর, ১৯৯৬ : ৫)। বাংলায় 'কলন' শব্দের একটি অর্থ 'গ্রাস'। নতুন দেশ বা ভূ-খণ্ডকে আয়ত্তীকরণের পূর্বে জেনে-বুঝে সার্বিক ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে দখলদারিত্বের প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করা যায়। এভাবেই 'সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল বিস্তৃত হয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দ্বীপ-রাষ্ট্র ও ভূ-খণ্ডের ওপর। .... দুটি পৃথক রাষ্ট্র, দুটি ভিন্ন সমাজ, আলাদা জনগোষ্ঠী যখন সম্পর্কে আসে, বিশেষ করে বহিরাগত শাসক ও অচেনা দূরদেশের শাসিতের বেলায় ভোগ্যসূচির এই পার্থক্য শাসক ও শাসকের দেশের ব্যবসায়ীকে সবচেয়ে বেশি ভাবায়। ভোগ্যসূচি এক করে তুলতে না পারলে শাসকের উৎপাদন কাঠামো ও প্রযুক্তি শাসিতের বাজার দখল করতে পারে না। ... ব্যবসায়ী ও শাসকেরা বুঝেছিলেন ভোগ্যসূচি এক করে দেওয়ার জন্য চিন্তা-শৃঙ্খলায় পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন। ফলে ... শাসক ক্রমশ শিক্ষাব্যবস্থা বা অবগত হওয়ার কাঠামোকেই বদলে দেন। শাসকের দিক থেকে রওনা দেয় তার দ্যোতক, চিহ্ন, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রতীক, ও রূপক। সঙ্গে থাকে শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান, শাসনের কঠোরতা, সেবার ভান।' (সমীর, ১৯৯৬ : ৬-৭)

৬. সহপাঠী ও দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদকে লিখিত চিঠিতে বিধৃত হয়েছে দেশ, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে লেখকের সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয় —
'আমাদের দেশটা দারিদ্র্যের কোন ভয়াবহ স্তরে আছে এবং একে টেনে তুলতে হলে সত্যিকারভাবে কতটুকু উদ্যোগ প্রয়োজন সেটা না বোঝাটা কিংবা বুঝতে চেষ্টা না করাটা সকলের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ... জাতি হিসেবে আমরা মরে যাচ্ছি দ্রুত। এখানে শুধু দুটো জিনিস আছে এই মুহূর্তে। বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্বরক্ষার তাগিদেই, সম্পদলাভের প্রচেষ্টা এবং সেই তৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেটা ঘটে, হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া। এই ব্যাপারটা অবশ্য আমাদের ভেতরেই, মধ্যবিত্ত আর কি, সীমাবদ্ধ। বাকি জনগোষ্ঠী স্বপ্ন দেখে না ... এই জনগোষ্ঠীর কি যে অবস্থা দাঁড়াবে সেটা আমার চিন্তায় আসে না। প্রত্যেকটি গতকাল এদের জন্য আজকের তুলনায় ভালোয় দাঁড়াচ্ছে। এভাবে আর কতদিন টিকবে। এদের জন্য দুঃখ বোধটাও এখন সত্যিকার অর্থে কুমিরের অশ্রুর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। তবু কেমন যেন খারাপ লাগে আমার।' (রশীদ, ২০১০ : ৬৩৯)

৭. লেখকের অভিমত —
'কাঁটাকে গভীরভাবে দেখা দরকার। কাঁটা হচ্ছে যে, খুব সহজ অর্থে আমরা যে, তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা মনে করি 'কাঁটা' সে রকম গল্প না। কারণ এখানে সব ধর্মের লোকের প্রতি মহল্লার লোকদের যে সহানুভূতি তা উল্লেখ আছে এবং তাদের অসহায়ত্বের কথা তো আছেই। দুই নম্বর, এই সব বিষয়ে তাদের যে অপরাধবোধ এইসব আছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় — সাম্প্রদায়িকতা অনেক গভীর জিনিস। তা বুঝা দরকার। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে দেখতে হবে মূল ফোকাসে।
সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু সম্প্রদায়েরই সমস্যা। সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সবারই সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা এবং এটা খুব গভীরে থাকে। যারা অসাম্প্রদায়িক বলে — এটা যখন বাংলাদেশ ছিল না, যারা অনেক নমস্য ব্যক্তি, সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে খুবই নমস্য মানে অসাম্প্রদায়িক তাদের গভীরে যদি আপনি ঢুকেন ... তাহলেও আপনি দেখবেন সাম্প্রদায়িকতা খুব গভীর একটা সমস্যা ফলে এখানে *'কাঁটা'* হচ্ছে ওই অর্থে। এ গল্পের নামটা আমি দুইবার পরিবর্তন করেছি। প্রথম লিখেছি *'কাঁটা'* পরে আবার লিখেছি *'মনোজগতের কাঁটা'*। আমার মনে হয়েছিল এটা একটু দেখানো দরকার এটা কীভাবে মনোজগতে থাকে। ... এটি রক্তের ভিতরে থাকে। পরে নাম আমি আবার চেঞ্জ করেছিলাম কিন্তু লোকের আপত্তিতে। আমার মনে হয়েছে যে, একদম বলে দেয়ার দরকার

নেই যে, এটা মনোজগতের কাঁটা। কাঁটা বিভিন্নভাবে আছে পাঠক ঠিক করে নিবে। কিন্তু আমার ভয় হয় — পাঠক অনেক সময় ঠিক করতে পারে না। এজন্য *'মনোজগতের কাঁটা'* লিখেই দিয়েছিলাম।' (রশীদ, ২০১০ : ৬২৪)

৮. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' (*দুই তীর ও অন্যান্য গল্প*) গল্পটি সচেতন ও সংবেদনশীল পাঠকের মনোভূমিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেননা তিনি এ গল্পটি রচনা করেছিলেন দেশভাগের পটভূমিতে। কলকাতার কয়েকজন নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলমান শরণার্থীর পূর্ববঙ্গের এক মফস্বল শহরে দশ দিনের জন্য আশ্রয়প্রাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ে নতুন ঠিকানার সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা গল্পটির উপজীব্য। তবে যে হিন্দু বাড়িওয়ালার বাড়িতে তারা অবস্থান করেছিল, সেই গৃহকর্ত্রীর অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ পরিণতি প্রসঙ্গে এ গল্পে লেখক সন্নিবিষ্ট করেছেন একটি তুলসী গাছকে, যেটি সেই নারীর ধর্মীয় মূল্যবোধকে অতিক্রম করে উন্নীত হয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্বহীনতার প্রতীকে। তুলসী গাছটিকে মোদাব্বের ও অন্যরা দেখতে পেয়েও শেষ পর্যন্ত মানবিকতার টানে উপড়ে ফেলতে পারেনি, বরং গোপনে পানিদান ও পরিচর্যার মাধ্যমে এর বিপন্ন অস্তিত্বকে প্রাণবান করেছে। জীবনে বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর লড়াই তাদের মতো তুলসী গাছটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য — এ উপলব্ধি ঘটায় তারা সেটির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়নি। তদুপরি এ গাছটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল গৃহকর্ত্রী সেই নারীর স্মৃতি, যে প্রাত্যহিক জীবনের নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও সন্ধ্যালগ্নে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সিঁদুরপরা মাথায় ঘোমটা টেনে প্রদীপ জ্বেলে তুলসীতলায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করত। এখন সেই নারী গৃহহারা, পরবাসী। তার অনিশ্চিত জীবন ও অস্তিত্বসংকটের সঙ্গে তুলসী গাছটির পরিণতিও সমার্থক হয়ে যায় কলকাতা থেকে আগত মানুষগুলোর সেই বাড়িটি পরিত্যাগের বাধ্যবাধকতায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আলী রিয়াজ (সম্পাদিত), ১৯৯৫। *সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ*, অঙ্কুর, ঢাকা।
উৎপল বিশ্বাস (সম্পাদিত), ২০০৭। *গণমুক্তি*, অষ্টম উদ্যোগ, ঢাকা।
কঙ্কর সিংহ, ২০০৭। *সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ২০০৪। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
জীনাত ইমতিয়াজ আলী, ২০০১। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ, ঢাকা।
শহিদুল ইসলাম, ২০০৮। *দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।
শহীদুল জহির, ২০০৪। *ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
শহীদুল জহির, ২০০৭। *নির্বাচিত গল্প*, সমাবেশ, ঢাকা।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, ১৯৮৭। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

প্রবন্ধপঞ্জি ও সাক্ষাৎকার

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, ২০১০। *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।
সমীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত), ১৯৯৬। সমীর রায়চৌধুরী, 'অব্যয়ীভাব সমাস', *পোস্টকলোনিয়ালিজম : উত্তর ঔপনিবেশিকতা*, হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী, কলকাতা।